ছোটদের

আজগুবি গল্প

কুমারেশ ঘোষ

৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রচ্ছদ ও ছবি : কাঞ্চী

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া ১৩৭১

তপতী ঘোষ কর্তৃক
গ্রন্থ-গৃহ, ৮এ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭ ও মন্মথ-মুদ্রণী,
'করুণাধারা' ২৮।৩।আর, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলিকাতা-৫৪ থেকে
যথাক্রমে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

পরম স্নেহের

নূপুর, ঝুমুর আর আপা-কে

দিলাম

—জেঠু

ছোটদের অন্যান্য বই

মজার গল্প

হাসির গল্প

ফাঁকি-স্থান (বড় গল্প)

চক্র (ছেলেমেয়েদের নাটিকা)

ম্যানিয়া (ছেলেদের একাংকিকা)

ফ্যাশন ট্রেনিং স্কুল (মেয়েদের নাটিকা)

মনীষী নাটিকা (১ম ও ২য় খণ্ড)

চালচলন (ভদ্রতা শেখবার বই)

ছোটদের

আজগুবি গল্প

কুমারেশ ঘোষ

যে যে গল্প আছে—

তুড়ুক-লাফ

আমাদের নন্তেদার সবেতেই নাক সেঁটকানো অভ্যাস।

কিছুই ওর মনের মত নয়।

আর কেবলই মুখে লেগে আছে, এটা করে কী হবে, ওটা করে কী হবে, সেটা করে কী লাভ? ইত্যাদি।

অথচ নন্তেদাকে না হলে আমাদের চলেও না যেন। সব কাজেই নন্তেদাকে চাই—আর সবেতেই তার ভুরু কোঁচকানো আর নাক সেঁটকানো না দেখলে আমাদেরও মন যেন ভরে না।

একদিন আমরা নন্তেদাকে বললাম, নন্তেদা, আজ আমাদের স্কুলে স্পোর্টস আছে, যাবে?

শুনেই নন্তেদা প্রথমেই ভুরু কোঁচকালো, কী হবে সেখানে গিয়ে? কী লাভ?

নন্তেদার মুখে এ ধরণের প্রশ্ন শোনা আমাদের অভ্যেস আছে। তাই বললাম, এই দেখবে আমরা কেমন দৌড় ঝাঁপ করি!

—তাতে কী লাভ? আবার প্রশ্ন।

—তাতে বুঝতে পারবে আমাদের কেরামতি।

—বলি, ওসব করে কী হবে? কেবল হাত-পা ভাঙার ব্যবস্থা। ওতে কোন লাভ নেই!

নন্তেদা যেন গম্ভীর হয়েই কথাগুলো বললো।

কিন্তু আমরাও নাছোড়বান্দা।

নেড়ুর ভাই কেরু বললো, বেশ তো নন্তেদা, স্পোর্টসে হাত-পা ভাঙে, আমাদেরই ভাঙবে। তোমার তো তাতে কোন লোকসান হবে না।

—তা বটে।

কেরু বললো, আর আমাদেরও লাভ হবে বৈকি?

—কি রকম ? নন্তেদা একটু অবাক হয়েই জিগ্যেস করলো।

কথাটা কেরু কী মতলবে বলেছিলো তা ধরতে আমার সময় লাগেনি। তাই ফট করে বললাম, বুঝচো না নন্তেদা ? হাত বা পা ভাঙলে দিব্যি কটা দিন নয়, কটা মাস বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দেবে, স্কুল যেতে হবে না। অথচ গুড-ব্যাড খাওয়া-দাওয়া ভাল মতোই চলবে।

—বটে ! নন্তেদা হেসে বললো, তবে এ ব্যাপারে তোদের লাভেরই সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া আমারও কোন লোকসানের ভয় নেই বলচিস ?

—ঠিক তাই। কেরু বললো।

—তবে ঠিক আছে।

নন্তেদা রাজী হয়ে গেল।

এবং সত্যিই নন্তেদা আমাদের সঙ্গে স্পোর্টসে গেল। আর আমরাও মহা উৎসাহে ফ্ল্যাট-রেস হার্ডল-রেস, ব্যাক-রেস, ফ্রগ-রেস, ত্রিপ্পাল-রেস, ইত্যাদি করলাম।

হাইজাম্প, লংজাম্পও বাদ গেল না। দু'একটা আইটেমে নেড়ু, কেরু বা আমি ফাষ্ট, সেকেন্ড বা থার্ডও হলাম।

আর স্পোর্টসের শেষে নন্তেদা-কে ধরলাম, কেমন দেখলে নন্তেদা ?

কিন্তু দেখলাম, নন্তেদা কেমন যেন একটু উদাস।

কেমন যেন আকাশের দিকে মুখ করে বললো, হ্যাঁ, দেখলাম। একটু থেমে বললো, চোখ আছে যখন দেখলাম বৈকি।

নন্তেদার কথায় আমরা যেন একটু মিইয়ে গেলাম। বললাম, কেন নন্তেদা, ভাল লাগলো না ?

—লাগলো একরকম। তেমনি উদাস হয়েই নন্তেদা বললো, তবে ঐ সব রেস বা হাইজাম্প-লং জাম্প করে কোন লাভ নেই।

—কেন ? আমি একটু বিরক্ত হয়েই জিগ্যেস করলাম।

নন্তেদা বললো, মানে, ঐ সব লম্ফ-ঝম্প না করে বরং শর্ট-ঝম্প শিখলে অনেক সময় কাজ দেয়।

—সে আবার কি ? আমরা তিনজনেই প্রায় এক সঙ্গে জিগ্যেস করলাম।

নন্তেদা মৃদু হেসে বললো, সে এক ব্যাপার। এখেনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলা যায় না। রাত্রে বাড়িতে আসিস বলবো'খন।

শর্ট-জাম্পটা আবার কী রে বাবা ?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাফ ? দড়ি-লাফ ?

আমরা ক'জনেই কেমন যেন গুলিয়ে গেলাম। রাত্রেই ছুটলাম নন্তেদার বাড়িতে। আমাদের সঙ্গে জুটলো পটলা আর গোপলাও।

শর্ট-জাম্পটা কি, আর সেটা শিখলে কী হয় জানা দরকার বৈকি !

নন্তেদা ভূমিকা করে বললো, তবে নিতান্তই শর্ট-জাম্পের গল্পটা শুনবি ?

আমরা সবাই প্রায় সমস্বরে বলে উঠলাম, হ্যাঁ নন্তেদা !

নেড়ু বললো, আমরা তা হলে এই নতুন আইটেমটা আসচে বছরে স্পোর্টসে ঢুকিয়ে দেবো।

—তবে শোন। নন্তেদা শুরু করলো ঃ কয়েক বছর আগে আমি আসামের এক জঙ্গলে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের একটা কাজ নিয়ে গেছলাম। কাজটা হচ্চে, লক্ষ্য রাখা কেউ যেন কাঠের জন্যে গাছ কেটে না নিয়ে যায়। তবে সে সব কাজ চৌকিদাররাই করতো আমি একবার সকাল বিকেল ঘুরে আসতাম সরকারী জীপে করে। আর সারা দিনটা কাটাতাম ঘুমিয়ে আর না হয় নভেল পড়ে।

—তারপর ? পটলা জিগ্যেস করলো। বুঝলাম সে এর মধ্যেই অধৈর্য হয়ে পড়েচে। আর আমিও নন্তেদার বন্য জীবন-যাপনের মধ্যে শর্ট-জাম্প-এর কোন গন্ধ না পেয়ে মনেমনে উসখুস করছিলাম। তবু চুপ করেই ছিলাম।

নন্তেদা বললো, হঠাৎ একদিন সদর থেকে আমার কাছে একখানা চিঠি এলো। একজন বিলিতী-সাহেব নাকি আসচেন আমার ওখানে। তাঁর শিকার করার ভারি শখ। অতএব আমি যেন তাঁর শিকারের ব্যবস্থা করে দিই। আর শুধু তাই নয়, তাঁর যাতে কোন অসুবিধে না হয় সেজন্যে আমি যেন তাঁর সঙ্গে যাই।

যা বাব্বা। চিঠি পেয়ে আমি তো হিম হয়ে গেলাম। সাহেবের শিকারের না হয় ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে, তা বলে আমাকে নিয়ে টানাটানি কেনরে বাবা ? সাহেবের শখ, কাজেই মনে হয় মরতেও ভয় পায় না। কিন্তু আমি মরলে যে চাকরিটাই যাবে প্রাণটাও যাবে।

এবার আর না থাকতে পেরে বলে ফেললাম, তা কি করলে নন্তেদা ?

—কী আর করবো। যেতে হলো। নন্তেদা করুণ সুরেই বললো,

সাহেবকে নিয়ে, লোকজন নিয়ে, বন্দুক-পিস্তল নিয়ে, দেশী বিলিতী খানা সঙ্গে নিয়ে 'দুগ্‌গা' বলে জীপে চেপে বসলাম।

শেষে গিয়ে পেঁছিলাম গভীর বনের মধ্যে। হঠাৎ একটা ঘন ঝোপ দেখিয়ে সাহেব বললো, এইখানেই বাঘের সন্ধান পাবো, পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্চি। থামো এখানে। ঐ যে পাহাড়ী ঝর্ণাটা দেখচো ওখানেই অনেক সময় বাঘ জল খেতে আসে, সেই সময়—বুঝলে ?

বলেই সাহেব মুচকি হাসলো।

দেখে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। জীবটা তার শুকনো জিব নিয়ে জল খেতে আসবে আর তখন তাকে মারতে হবে ? আহা-হা, কী বীরপুরুষ রে ! তবু সুবোধ বালকের মতোই বললাম, অল রাইট স্যার।

আমরা জীপ থেকে নামলাম। সাহেব আর সবাইকে একটু আড়ালে যেতে বলে, নিজে তাঁর বন্দুকটা নিয়ে আর একটা আমার হাতে গছিয়ে দিয়ে বললো, আমরা দু'জন ওখানে থাকি।

আরো বোঝালো সাহেব, বাঘটা বন্দুকের নাগালের মধ্যে এলেই আমি ফায়ার করবো। যদি মিস করি তখন তুমি ফায়ার করবে। রাইট ?

কিন্তু আমি এবার রাইট এবাউট টার্ণের ব্যবস্থাই করলাম। আরে বাবা, নিজে বাঁচলে বাপের নাম। বললাম, স্যার, তার চাইতে একটা কাজ করলে হয় না ?

—হোয়াট ?

কাছেই একটা গাছ দেখিয়ে বললাম, আমি বরং ঐ গাছে উঠে দেখবো বাঘ আসচে কিনা। দেখলেই আমার রুমালটা ফেলে দেবে মাটিতে আর আপনি তখন তাক করে—রাইট স্যার ?

খুব ভাগ্যি সাহেব রাজী হয়ে গেল, হয়তো বুঝলো আমার বীরত্বের বহরটা। তা বুঝকগে। বললো, অল রাইট।

ব্যস ! সঙ্গে সঙ্গে আমি বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে ধড়ফড়িয়ে কাছের গাছটায় গিয়ে উঠলাম। যাক বাবা, তবু একটু সামলে থাকা গেল।

—তারপর ? এবার কেরু অধৈর্য হলো।

নন্তেদা হেসে বললো, দাঁড়া, আগে বাঘকে আসতে দে—

অগত্যা আমরা একটু দম ধরেই রইলাম। বাঘ আসুক।

—হ্যাঁ, ঠিক। নন্তেদা বললো, একটু পরেই দেখি একটা বাঘ—ইয়া লম্বা,

হলদে-কালো ডোরাকাটা—গুটিগুটি এগিয়ে আসচে। দেখেই তো আমার চক্ষু ছানাবড়া। হাত পা যেন কাঁপতে লাগলো। আমি প্রাণপণে গাছের একটা ডাল জাপটে ধরে আমার রুমালখানা ফেলে দিলাম সাহেবের সামনে। কিন্তু সাহেব এক কাণ্ড করে বসলো—বলেই নন্তেদা থেমে গেল।

এ যেন ট্রেন চলতে চলতে হঠাৎ ছাইগাদা স্টেশনে থেমে যাওয়া। ধ্যেৎ—

আর থাকতে না পেরে আমরা বলে উঠলাম, কী কাণ্ড করলো সাহেবটা ?

নন্তেদা একটু হেসে বললো, সাহেব হয়তো আমার ইসারা বিশ্বাস করলো না। তাই ঝোপ থেকে ওস্তাদি করে যেই একটু বেরিয়েচে, ব্যস, বাঘটা দিলো একটা জাম্প। লং জাম্প।

আমি তো দেখেই গাছ থেকে 'বাপস' করে উঠলাম। কিন্তু নীচের দিকে নজর পড়তেই দেখি, এক মজার কাণ্ড ঘটে গেচে।

আবার যাতে নন্তেদা না থেমে যায় তাই তাড়াতাড়ি বললাম, কী মজার কাণ্ড ? কী— ?

নন্তেদা না-থেমে বললো, দেখি, বাঘটা লং-জাম্প দেবার সময় হিসেব ভুল করে ফেলেচে। সাহেবটাকে লাফ দিয়ে ধরতে গিয়ে তাকে ডিঙিয়ে চার-পাঁচ হাত দূরে গিয়ে পড়েচে। আর সাহেবও সেই ফাঁকে তরতর করে পাশেই আর একটা গাছে উঠে বসেচে। যাক—বুঝলাম, সাহেবের মেমসাহেবের সিঁথির সিঁদুর তো নয়, বিয়ের আংটিটার জোর আছে।

ওদিক কেঁদো বাঘটা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, শিকার হাওয়া। এদিক-ওদিক অনেক খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো, কিন্তু আর দেখতে পেলো না তার শিকারকে। তখন হয়তো মনের দুঃখেই আস্তে আস্তে গেল যেদিক থেকে এসেছিলো। আমরাও ভাবলাম, বুঝি সত্যিই চলে গেল বাঘটা। কাজেই নামতে যাবো গাছ থেকে এমন সময় হঠাৎ নজর পড়লো, বাঘটা আবার আমাদের দিকেই আসচে। আর এবার ঐ ঝোপের কাছাকাছি এসে যা কাণ্ড করতে লাগলো দেখে তো আমি অবাক !

অবাক নন্তেদা থমকে থামলো ! এ যেন হকির বল। স্টিক দিয়ে না হাঁকড়ালে বল যেমন খানিকটা গড়িয়ে থেমে যায় এও যেন তেমনি। তাই আবার খোঁচাতে হলো ঃ হ্যাঁ নন্তেদা, কী কাণ্ড করতে লাগলো বাঘটা ?

নন্তেদা এবার গম্ভীর হয়ে বললো, দেখি, বাঘটা একটুখানি জায়গায়

তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে শর্ট-জাম্প প্র্যাকটিস করচে। যাকে বলে তুড়ুক-লাফ। তাই বলছিলাম—

—এ্যাঁ! বলো কি নন্তেদা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—আর তোমরা কী করলে?

—আমরা বাঘের মজা দেখতে লাগলাম।

পরে নন্তেদা বললো, তারপর বাঘটা ঘেমে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে যখন চলে গেল তখন আমরা খানিক অপেক্ষা করে সদলবলে কেটে পড়লাম সেখান থেকে। খানিকটা পথ খুব জোরে পার হয়ে এসে বললাম, এবার আর হুড়োহুড়ির দরকার নেই, আস্তে আস্তে চলাই যাক।

—কেন? কেন? আবার আমাদের প্রশ্ন?

—কেন আবার? নন্তেদা দাঁত খিঁচিয়ে বললো, বুঝতে পারছিস না? বাঘটা তার জীবনে আর কখনো লং-জাম্প করবে না। যা একবার ঠকে গেচে।

ভীড়

একবার শুধু আমি আর নন্তেদা গেছলাম কোন্নগরে আমাদের এক জানা ভদ্রলোকের বাড়িতে বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে।

নেমন্তন্ন তো খাওয়া গেল। ভালই খাওয়া গেল। আমি আবার বেশি খেতে পারিনে। আর খিদের মুখে হলে তো লুচি ডাল আর কুমড়োর ছক্কা দিয়েই পেটটা ভরিয়ে ফেলি। পরে মাছ মাংস দই মিষ্টি এলে তখন আর পেটে জায়গা থাকে না।

আমি দেখেচি, নেমন্তন্ন খেতে গিয়েও বেশ হিসেব করেই খেতে হয়।

সেদিক দিয়েও নন্তেদা বেশ হিসেব করেই খায় দেখলাম। আর যা খায়! বাপস! ওর মাথাটুকুই বুঝি নিরেট, আর পা পর্যন্ত সব পেট। মাংস নিলো দু'তিনবার, দই নিলো চারবার, আর ঐ ভরা পেটে লেডিকেনি খেলো প্রায় দশ-বারোটা, আর সন্দেশ গোটা আষ্টেক।

আমি ভয় পেয়ে বললাম, নন্তেদা অত খেয়ো না। রাস্তায় মরে পড়ে থাকলে আমাকেই তো বয়ে নিয়ে যেতে হবে!

তাতে ধমক দিলো নন্তেদা: তুই চুপ কর বাতাসানন্দ স্বামী। তুই বাতাস খেয়ে থাকগে যা। নেমন্তন্ন মানেই হচ্চে—নে মন, তুই অন্ন খা। মানে, যত পারিস খেয়ে যা! আর বিশেষ করে আজকের রেশনের দিনে।

হেসে বললাম, খাও তবে।

আপ-রুচি-খানা খেয়ে-দেয়ে কোন্নগর ষ্টেসনে এলাম একটা রিকসায় করে। ট্রেন এলো। ভাবলাম, রাতের ট্রেন, ভিড় কমই হবে! ও হরি, তখনও দেখি ট্রেন ভর্তি লোক। এতক্ষণ কি লোকগুলো কলকাতায় যাবার কথা ভুলে গেছলো? এখন তাই দল পাকিয়ে—

যাই হোক, ঠেলে ঠুলে তো ওঠা গেল একটা কামরায়। কামরার মাঝখানে ঝুলোন হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে লাগলাম দু'জনে।

ভরা পেটে এভাবে ঝোলা যেন ফাঁসির খাওয়া খেয়ে একেবারে ঝুলে পড়ার মতোই।

আর শুধু কি ঝোলা ?

চারপাশে লোকের কী চাপ ? যেন পিষে ফেলচে। আর তার মধ্যে ঝুড়ি-ঝোড়া, পোঁটলা-পুটলি। তাছাড়া ভেন্ডারদের বাক্স আর স্যুটকেসের গুঁতো !

বললাম, এ কম্মোভোগ আছে জানলে আসতাম না কিন্তু !

শুনে নন্তেদা বললো, এতেই পাগল হয়ে গেলি ? এ আর কী চাপ ? অফিস টাইমে বাসে-ট্রামে চড়িসনি ?

—চড়েচি, তবে এখন যেন আরো কষ্ট হচ্চে। হয়তো ভরা পেট বলে—

—সাবধান, পেটে যেন বেশি চাপ না পড়ে ! তা হলেই—

—না, না। বরং সে ভয় তোমারই !

—তা ভয়ের বৈকি ! এই চাপে পড়ে আমার একবার কি হয়েছিলো জানিস ?

—কী ? বেশ কৌতুহলী হলাম।

নন্তেদা বললো, আরে, সে কথা আর বলিসনে। সে এক যাচ্ছেতাই ব্যাপার। একটা চটের রেশন ব্যাগে করে টুকিটাকি বাজার সেরে বাসে উঠেছিলাম। বাসটায় ভীড় তখন একটু কমই ছিল, কিন্তু এসপ্লানেডের মোড়ে হুড়মুড় করে লোক ঢুকলো বাসটার মধ্যে ! কাজেই দরজার কাছ থেকে ঠেলা খেতে খেতে এসে দাঁড়ালাম একটা লেডিজ-সীটের পাশে। তিনদিকে লোকের চাপ, আর সামনের লেডিজ-সীটের হেলান দেওয়া জায়গাটার গায়ে আমি গোঁচ চেপে। ডান হাতে হ্যাণ্ডেলটা ধরে, বাঁ হাতে জিনিস ভর্তি ব্যাগটা নিয়ে ধরে আছি লেডিস-সীটের সামনের সীটটার কোনটায়। আমার রেশন ব্যাগটাও গেচে চেপটে, আমার আর এক ভদ্রলোকের মাঝখানে। ভাবলাম তা যাক। ওর মধ্যে ভাঙবার জিনিস তেমন কিছুই নেই—

নন্তেদা বলতে লাগলো, আর জানিস তো কলকাতার রাস্তা আর স্টেটবাসের অবস্থা ! তাছাড়া ড্রাইভারের চালানোর ছিরি ! বাসে যাচ্চি না তো, যেন ভালুক-নাচ নাচতে নাচতে যাচ্চি। আর পথঘাট কিছুই দেখা যায় না। কাজেই চোখ বুজে রড ধরে ঝুলচি !

—ও মশাই, এ কী করচেন ?

হঠাৎ আমার সামনের লেডিজ-সীটে বসা এক ভদ্রমহিলা চীৎকার করে উঠলেন।

চমকে চেয়ে দেখি, ভদ্রমহিলা আমাকেই লক্ষ্য করে বলচেন, আপনার থলে থেকে দেখুন তো কী পড়লো আমার শাড়িতে !

আমি কেন, কাছাকাছি সবাই দেখলাম, সত্যিই কী যেন পড়েচে তাঁর শাড়িতে।

ভদ্রমহিলা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, আমার দামী শাড়িখানা নষ্ট করে দিলেন তো ? এখন কী হবে ? আমি কী করে এই শাড়ি প'রে—

চাপা কান্নায় ভদ্রমহিলার গলায় কথাই বুঝি আটকে গেল।

দেখলাম, সত্যিই শাড়িখানা দামী আর ভদ্রমহিলা বেশ সেজেগুজেই বেরিয়েচেন !

কিন্তু অবাক হলাম আমি। আমার থলেতে তো তেমন কিছু নেই।

ততক্ষণে চারিদিক থেকে নানারকম প্রশ্নবান শুরু হয়ে গেচে ঃ

—হ্যাঁ মশায় ? থলের মধ্যে তেল নিয়ে চলেচেন নাকি ?

—তেলের শিশির মুখ বোধহয় খুলে গেচে।

—এভাবে তেল নিয়ে কেউ বাসে উঠে ?

শুনে আমি বোকা হয়ে গেলাম। আমতা-আমতা করে বললাম, না, না, আমার থলেতে তেল নেই।

আমার ডানপাশের ভদ্রলোকটি দেখলাম অতি উৎসাহী। তিনি 'দেখি' বলে নীচু হয়েই আমার থলেটা পরীক্ষা করে বললেন, হ্যাঁ, তেলই তো। সরষের তেল। বেশ ঝাঁঝালো। খাঁটি তেল।

তাঁর রিপোর্ট শুনে লোকেরা আমাকে এই মারে তো এই মারে !

—হ্যাঁ মশাই, আবার মিথ্যে কথা বলচেন ! লজ্জা করে না ?

দেখলাম, চারধারে বেশ হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেচে।

কিন্তু আমিও তখন বুক ফুলিয়ে বললাম, মিথ্যে কথা বলতে যাবো কেন ? বেশ তো, দেখুন না আমার থলে ! দাঁড়ান, দেখাচ্চি খুলে—

বলেই থলেটা ফাঁক করে দেখালাম !

এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেল নন্তেদা।

ঐ বড় দোষ নন্তেদার। কোন কিছুর শেষ করতে চায় না। বিশেষ করে দরকারী কথা।

অধৈর্য হয়ে বললাম, কী দেখলে নন্তেদা ?

—দেখলাম ? নন্তেদা বললো, যা দেখলাম তা অদ্ভুত! সরষে কিনেছিলাম আড়াইশো। রেখেছিলাম ঐ থলেতে। লোকের ভিড়ের চাপে পিষে গিয়ে সেই সরষে থেকে তেল পড়চে চুঁইয়ে! আর কাগজের ঠোঙার মধ্যে পড়ে আছে খানিকটা খোল।···এই যে, হাওড়া স্টেশন এসে গেচে।

নন্তেদার গল্প শুনে আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম। আর কিছু বলবার আগেই নন্তেদা বললো, আচ্ছা চলি, আমাকে আবার অনেক দূরে যেতে হবে।

আর বললো, তবে হ্যাঁ, থলের মধ্যে একটা সানলাইট সাবান ছিল, সেটা ভদ্রতা করে ভদ্রমহিলাকে দিয়ে দিয়েছিলাম।

বলেই ট্রেন থামবার আগেই নন্তেদা প্ল্যাটফর্মে নেমে মিশে গেল ভীড়ের মধ্যে।

হেয়ার টনিক

সেদিন রাস্তায় হঠাৎ নন্তেদা-র সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দেখলাম, নন্তেদা বেশ গম্ভীর।

অথচ নন্তেদা সব সময়েই বেশ হাসিখুশি ভাব নিয়েই থাকে, আর বেশ খোশ-মেজাজী।

চিন্তিত হয়েই জিগ্যেস করলাম, নন্তেদা, তোমাকে এমন মনমরা দেখাচ্চে কেন? মনে হচ্চে, তুমি যেন অন্যমনস্ক। কী নিয়ে ভাবচো? কী ব্যাপার?

নন্তেদা একটু ম্লান হেসে বললো, ধরেচিস ঠিকই। মনটা ভাল নেই। একটা টেম্পোরারি চাকরি করছিলাম, জবাব হয়ে গেচে। তাই ভাবচি আর চাকরি-বাকরি করবো না। এবার নিজেই কিছু করবার চেষ্টা করবো। তাছাড়া আজকাল নতুন কোন ব্যবসা করতে গেলে গভর্ণমেণ্ট থেকে ব্যাংক থেকে টাকাও পওয়া যাচ্চে।

—তা, কী ব্যবসা করবে ঠিক করেচো? জিগ্যেস করলাম।

—ভাবচি একটা তেল বাজারে বার করবো।

—তেল? কিসের তেল নন্তেদা? নারকেলের তেল, সুবাসিত নারকেল তেল বা তিল তেল?

—না, না। নন্তেদা বললো, ওসব কিছু নয়। ও রকম তেল তো বাজারে ছেয়ে আছে।

—তবে।

—টাকের তেল তৈরী করবো।

—টাকের তেল?

—হ্যাঁ, টাকে চুল গজাবার তেল। মেডিকেটেড হেয়ার অয়েল বা টনিক। একটা নামও তার ঠিক করে ফেলেচি।

জিগ্যেস করলাম, কী নাম?

নন্তেদা গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো, বল্ড-উইন হেয়ার টনিক। মানে বল্ড-হেড বা টাক মাথাকে যে তেল উইন করবে বা জিতে নেবে। আর তেল বা অয়েল না বলে বলবো টনিক। বেশ একটা ওষুধ-ওষুধ ভাব থাকবে। তাছাড়া জানিস তো, বল্ডউইন নামে ইংল্যাণ্ডে এক প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন। কাজেই নামটা খুব জোরদার হবে। কী বলিস ?

হেসে বললাম, তা মন্দ বলোনি নন্তেদা। আর জানো তো, রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর মস্ত টাক ছিলো, তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আদর করে ডাকতেন 'বল্ডউইন' বলে।

—জানি। নন্তেদা বললো, আর জানিস, এই নিয়ে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল একবার ?

—না, জানিনে তো। স্বীকার করলাম।

সবজান্তা নন্তেদা আবার একটু হেসে বললেন, একদিন কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ সুধাকান্তকে বললেন, দ্যাখ বল্ডউইন, আমার বয়েস হয়েচে তাই চুলগুলো পেকে সাদা হয়ে গেচে, তবুও আমার মাথায় কত ঘন কোঁকড়ানো চুল, আর তোর মাথাটা একেবারে টাকে ভর্তি। লোকসমাজে তোকে আমার সেক্রেটারী বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা করে। তোকে আমি সেক্রেটারীর পদ থেকে ডিসমিস করে দেবো। শুনে সুধাকান্ত নিজের টাক চুলকে বললেন, গুরুদেব, আপনি ঠিক কথাই বলেচেন। তবে শুনুন, এই টাক আমার পৈতৃক সম্পত্তি। আমার বাবার মাথায় ছিল, ঠাকুর্দার মাথায়ও ছিল শুনেচি। আর তাছাড়া আপনি জানেন তো, আমি টাকির জমিদার রায়চৌধুরী বংশের ছেলে। কাজেই আমার মাথায় টাক তো থাকবেই। এই টাকই আমাদের বংশের গৌরব, ঐতিহ্য। শুনে রবীন্দ্রনাথ আর জবাব দিতে পারলেন না, হেসে বললেন, যাক, তোর চাকরিটা রয়ে গেল দেখচি !

শুনে বললাম, বাঃ, চমৎকার মজার গল্প তো।—তারপরেই বললাম, আচ্ছা নন্তেদা, তুমি হঠাৎ এত রকম ব্যবসা থাকতে টাকের ওষুধ বা তেল তৈরী করবে ঠিক করলে কেন ?

নন্তেদা বললো, অনেক ভেবে চিন্তেই এই ব্যবসায় নামবো ঠিক করেচি। দ্যাখ, ভেবে দেখলাম, টাক কাদের হয় ? বড়লোকদেরই, যাদের টাকা আছে। গরীব কুলি মজুরদের মাথায় টাক দেখেচিস ? কাজেই বড়লোকরাই তাদের টাকের জন্যে টাকা খরচ করতে পারবে আর করেও থাকে। কাজেই এই

ব্যবসাই সহজে ফুলে ফেঁপে উঠবে। তাছাড়া অল্প বয়সে কারোর টাক হলে সে তো উঠে-পড়ে লাগবে টাকে চুল গজাবার জন্যে!

হেসে বললাম, যাক, মতলব করেচো ভালই।

তারপর মাস খানেকেরও বেশি আমাকে বাইরে থাকতে হলো, শরীর সারাতে, পশ্চিমে। তবে চিঠিপত্রের মাধ্যমেই কলকাতার সঙ্গে সামান্যই যোগাযোগ ছিল। নন্তেদার খবরও জানা ছিল না। নন্তেদা তাঁর বল্ডউইন হেয়ার টনিক বার করেচে কিনা কে জানে। আর করে থাকলেও কেমন চলচে তাও জানতাম না। আর সেখানে বাংলা খবরের কাগজ মাঝেমাঝে যা চোখে পড়তো, তাতে সেরকম কোন টাকের ওষুধের বিজ্ঞাপনও দেখা যেতো না। শুনেচি এ ধরণের কোন ওষুধ বা তেল বার করলে প্রচারের জন্যে বেশ কিছু টাকা বিজ্ঞাপনে খরচ করতে হয়। লোককে জানাতে হয়। জিনিসের প্রশংসা করে জনসাধারণের কাছে প্রচার করতে হয়। নইলে লোকে জানবে কী করে?

বিজ্ঞাপন মানেই কেবল আত্মপ্রচার। ভাবটা, ওগো, এমন জিনিস আর হয় না। এসো, তোমরা কেনো। না কিনলে ঠকবে। পরে হাত কামড়াতে হবে—ইত্যাদি।

নন্তেদা সেরকম কোন বিজ্ঞাপন, কই দিচ্চে না তো? না কি, শেষ পর্যন্ত তার বদলে গেচে মতটা?

তাই পরে যখন কলকাতায় ফিরে এলাম, তখন সময় করে একদিন গেলাম নন্তেদা-র বাড়িতে। তবে তার দেখা পেলাম না। বাড়ির চাকরটা বললো, এজ্ঞে, বাবু তো এখন বেশির ভাগ সময় দোকানেই থাকেন।

জিগ্যেস করলাম, কোন দোকানে?

—এজ্ঞে, তার নিজের দোকানে।

—কিসের দোকান?

চাকরটা হেসে মাথা চুলকে বললো, এজ্ঞে, টেকের তেলের দোকান।

ও, তা হলে নন্তেদা টাকের তেল বার করেচে!

জিগ্যেস করলাম, তা বাবুর টাকের তেল কোথায় তৈরী হয়?

—কেন, বাড়িতেই। আসেন না, দ্যাখেন না?

চাকরটা আমাকে চিনতো। কাজেই বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে দেখালো, উঠোনে কাঁচের বড় বড় জার ড্রাম শিশি বোতল ছিপি প্যাকিং বাক্স খড়

ইত্যাদি। আর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখালো সে, দু'তিনজন স্ত্রীলোক আর দুটি ছোট ছেলে মেঝেয় বসে শিশিতে তেল ভরচে, ছিপি আঁটচে, লেবেল লাগাচ্চে।

বটে! কারবার যেন ভালই চলচে মনে হলো।

চাকরটা একগাল হেসে বললো, কেমন দ্যাখলেন বাবু?

হেসে বললাম, ভালই। তা তোমার বাবুর দোকানের ঠিকানাটা আমাকে দাও তো, সেখানেই দেখা করবো।

—দাঁড়ান, দিচ্চি। বলেই একটা ছাপানো লেবেল আমার হাতে দিয়ে বললো, ওতেই সব ন্যাকা আছে।

পড়ে দেখলাম কাগজটায় লেখা ঃ সন্ন্যাসীপ্রদত্ত বল্ডউইন হেয়ার টনিক। গ্যারান্টিযুক্ত। যেকোন প্রকার টাকের উপযুক্ত মহৌষধ। বল্ডউইন কেমিক্যাল ওয়ার্কস। আর দেখলাম, তাতে লেখা দোকানের ঠিকানা।

কাগজটা পকেটে ভরে নিয়ে বললাম, আচ্ছা চলি।

চাকরটা হেসে বললো, আচ্ছা। তা বাবু, একটু চা খাবেন নি?

—না, দেরী হয়ে যাবে। চলি।

পথে যেতে যেতে ভাবলাম, নন্তেদা তাহলে ভালই ব্যবসা করচে। আর বাড়িটাকে দিব্যি কারখানা বানিয়ে ফেলেচে। তা কোন তো অসুবিধে নেই। বিয়েথা করেনি। থাকার মধ্যে তো তার বুড়ি মা।

নন্তেদার দোকানে গিয়ে দেখি, বেশ সাজানো-গোছানো দোকান। বাইরে সাইনবোর্ড। ভেতরে আলমারিতে বল্ডউইন হেয়ার টনিকের সব ওষুধের শিশি সাজানো। আর সেল-কাউন্টারে একটি মোটা গোছের তরুণী দাঁড়িয়ে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে নন্তেদা কী যেন বলচে মেয়েটিকে।

আমাকে দেখেই নন্তেদা চেঁচিয়ে উঠলো, আরে তুই এখানে? কবে এলি? দোকানের ঠিকানা কোথায় পেলি?

একসঙ্গে তার এতগুলো প্রশ্নের জবাব এক-এক করে দিয়ে বললাম, তা তোমার টাকের ওষুধের কারবার তো ভালই চলচে দেখচি।

নন্তেদা বললো, এই চলচে একরকম। আয়, আয়, ভেতরে আয়।

নন্তেদা আমাকে সেল-কাউন্টারের পেছনে তার টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসালো আমাকে, নিজেও বসলো তার চেয়ারে। বললো, তারপর বল কেমন আচিস?

—ভালই। কলকাতায় ফিরে এলাম, তাই ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। যাক, তাহলে শেষপর্যন্ত যা বলেছিলে, তাই করলে। ভালই।

নন্তেদা হেসে বললো, কেন, তোর নন্তেদাকে এখনও চিনিসনি বুঝি? এক বলেই, মরদকা বাৎ হাতিকা লাথ। বুঝলি?

বললাম, তা তোমার এই বন্ডেউইন হেয়ার টনিকের বিজ্ঞাপন দাও না কাগজে?

—দিতাম। তবে এখন তেমন দিই না। খুব চালু হয়ে গেচে। অবশ্য মাঝে মাঝে দিতে হয়।

কথা বলতে-বলতে দেখলাম, কয়েকজন খদ্দের সেল-কাউন্টারে এসে ঐ সেলস-গার্লটির কাছ থেকে টাকের তেল কিনে নিয়ে গেল। কেউ এক শিশি, কেউ দু'শিশি। বাইরের এক দোকানদার আধ ডজন কিনলো একসঙ্গে।

নন্তেদা তাদের দিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে, আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে নীচুগলায় বললো, দেখচিস তো?

—দেখলাম! পরে বললাম, আচ্ছা নন্তেদা, সেল-কাউন্টারে ঐ মেয়েটিকে রেখেচো কেন? কোন ছেলেকে রাখলেও তো পারতে?

—কারণ আছে। নন্তেদা বললো হেসে, সেলস-গার্লই দরকার। সেজন্যে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলাম। অনেক মেয়ে এসেছিলো চাকরির জন্যে। পরে বেছে ঐ মেয়েটিকেই রেখেচি।

—কেন, খুব ভাল বিক্রী-টিক্রি করতে পারে বুঝি?

—না, তা নয়।

—তবে?

—অনেক সময় বেকায়দায় পড়লে, ঐ মেয়েটিই তখন উদ্ধার করে আমাকে।

কথাটা শুনে কৌতুহলী হলাম। বললাম, তোমার কথাটা বুঝলাম না ঠিক! কোন খদ্দের এসে গোলমাল করলে তখন তো কোন পুরুষমানুষেরই দরকার হয়।

—তা হয়। বলেই নন্তেদা হেসে বললো, তবে জানিসনে, মা দুর্গা মেয়েমানুষ, আর তাঁকে বলা হয় দুর্গতিনাশিনী। মেয়েরাই তো শক্তিরূপিণী।

বললাম, তা বটে। তবে মনে হচ্চে, তুমি কিছু চেপে যাচ্চো।

নন্তেদা বললো, তা যদি মনে করিস তো তাই-ই। মনে কর বিজনেস-সিক্রেট। সবাইকে কি সব কথা বলা যায়?

শুনে একটু অভিমান করেই বললাম, বিশ্বাস না হয় তো দরকার নেই বলবার।

উঠতে যাচ্ছিলাম, আচ্ছা চলি এখন।

—না, না বোস। নন্তেদা যেন থাবা মেরে বসিয়ে দিলো, এই এলি, এখনি যাবি কেন? কতদিন পরে দেখা বল? একটু চা খেয়ে যা—

এমন সময় এক ভদ্রলোক দোকানে ঢুকলেন। মাঝারি বয়েস। মাথায় বিরাট টাক। আর একজোড়া মোটা গোঁফ।

সেল-কাউণ্টারে এসে মেয়েটিকে বললেন, কই দেখি, টাকে চুল গজাবার কী হেয়ার টনিক আছে আপনাদের।

মেয়েটি একটি শিশি বার করে ভদ্রলোককে দিলেন।

ভদ্রলোক শিশিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, এমন গ্যারাণ্টি-ফ্যারাণ্টি তো অনেকেই লেখে, কিন্তু সত্যিই কি চুল গজাবে টাকে?

—দেখুন না ব্যবহার করে? মেয়েটি হেসে উত্তর দিলো।

ভদ্রলোক জবাবে বললেন, অনেক রকম তেল ওষুধ ব্যবহার করেচি এই টাকে। কিসসু হয়নি। বহু টাকা খরচ করেচি এজন্যে। সব জলে গেচে। তবু আপনাদের বল্ডউইন হেয়ার টনিকের কথা শুনে ভাবলাম, যাই একবার দেখে আসি। তা দেখুন, আপনাদের এই এক শিশি কিনতে পারি কিন্তু কোন ফল না হলে টাকা ফেরত দিতে হবে।

মেয়েটি বললো, আগে ব্যবহার করেই দেখুন না, অত অবিশ্বাস করচেন কেন?

বেশ কথা কাটাকাটি হচ্চে দেখে নন্তেদা তার চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে সেল-কাউণ্টারের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন মেয়েটির পাশে। কী হয় দেখবার জন্যে। আমিও নন্তেদার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ভদ্রলোক বললেন, অমন বাজে বাত্তেলা মারে সবাই। আমি অমন ঢের দেখেচি।

এবার উত্তর দিলো নন্তেদা। বললো, আপনি তো দেখচি মশায় ঝগড়া করতে এসেচেন। আমাদের হেয়ার টনিক ব্যবহারই করলেন না, অথচ—

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন, বিশ্বাস করে অনেক ঠকেচি। অনেক টাকা জলে দিয়েচি। তাই আর এইসব ওষুধে বিশ্বাস করতে মন চায় না।

—বেশ, আপনি যাতে বিশ্বাস করেন তার প্রমাণ আমি এখুনি দিচ্চি। নন্তেদা কথাটা বেশ জোর গলায় বললেন।

শুনে ভদ্রলোক একটু অবাক হলেন। আমিও।

নন্তেদা বলে কি? এখুনি প্রমাণ দেবে!

নন্তেদা পাশের সেলস-গার্লটিকে দেখিয়ে বললো, আপনি এই মেয়েটিকে দেখচেন?

ভদ্রলোক একটু রাগত সুরেই বললেন, দেখতে পাচ্চি বৈকি! কানা তো নই। আর জলজ্যান্ত যখন দাঁড়িয়ে আছেন।

নন্তেদা বললো, বেশ ভাল করে দেখুন।

থতমত খেয়ে ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ দেখচি তো। ভাল করেই দেখচি।

—কী দেখচেন?

ভদ্রলোক এবার একটু রেগেই বললেন, কী আবার দেখবো, একটি মেয়েকে্য দেখচি। হ্যাঁ মশায়, আপনি কী বলতে চান, আমি এখানে বিয়ের জন্যে মেয়ে দেখতে এসেচি?

নন্তেদা হেসে বললো, না, না, আমরাও এই মেয়েটিকে কারোর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে এখানে দাঁড় করিয়ে রাখিনি। এই মেয়েটি আমাদের সেলস-গার্ল হলেও নট ফর সেল।

ভদ্রলোক এবার অধৈর্য হয়ে বললেন, আপনি কী বলতে চান বলুন তো খুলে!

নন্তেদা বললো, আমি বলতে চাই, মেয়েটিকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখুন। আচ্ছা, মেয়েদের কখনও গোঁফ গজায় দেখেচেন?

—না। ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন।

—কিন্তু এ মেয়েটির কী দেখচেন? জেরা করলো নন্তেদা।

—অল্প অল্প গোঁফের রেখা।

আমিও দেখলাম তখন, সত্যিই মেয়েটির উপরের ঠোঁটে বেশ গোঁফের রেখা।

—ঠিক ধরেচেন। আরো বেশি রকম গোঁফ হয়ে যেতো, ভাগ্যিস—

ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, তা আপনাদের হেয়ার টনিকের সঙ্গে ওঁর ঐ গোঁফের রেখার কী সম্বন্ধ?

—আছে মশায় আছে। নন্তেদা বললো, আমাদের হেয়ার-টনিকের শিশির ছিপিটা একদিন ঐ মেয়েটি তার দাঁতে চেপে খুলতে গেছলো। আর ব্যাস, ছিপি হঠাৎ খুলে গিয়ে দু'চার ফোঁটা ওর ঐ ঠোঁটের ওপরে ছিটকে পড়লো। আর তার দুদিন পরেই ঐ কাণ্ড। ওখানে চুল গজিয়ে গেল। আমার কথা বিশ্বাস না হয় তো ওর কাছেই শুনুন।

শুনে ভদ্রলোক হতভম্ব। আমিও তাই।

ভদ্রলোক মেয়েটিকে জিগ্যেস করলেন, তাই নাকি?

উত্তরে মেয়েটি মিষ্টি হাসলো। অর্থাৎ, হ্যাঁ। তখুনি ভদ্রলোক টাকা বার করে বললেন, দিন আমাকে তিন শিশি।

নন্তেদা আর সেখানে না দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে টেনে চেয়ারে বসিয়ে বললো, বোস, চা খাবি।

আমার তখন মাথা ঘুরচে।

শ্লেজ

সেদিন নন্তেদা আমদের বাড়িতে এসে বলে গেল, পরশু আমার জন্মদিন, তুই তোর ছোট্ট ভাই বোনদের নিয়ে আসবি—বর্ষা বৃষ্টি মিষ্টি আর দুষ্টু। বেশ নাম ওদের। আর ওরা আমার গল্প শুনতে খুব ভালবাসে। তোরা রাত্রে এখানে খাবি, বুঝলি ?

ঘাড় নেড়ে বললাম, আচ্ছা।

দুদিন পরে নন্তেদার জন্মদিনে যেতে কিন্তু দেরি হয়ে গেলো। দেরি হয়ে গেল সাজগোছ করতে গিয়ে। আমার নয়। মুস্কিল হলো দুষ্টুকে নিয়ে। বর্ষা বৃষ্টি মিষ্টির তিনজনেরই এক রকম রংয়ের, একই রকম ছাঁট-কাটের ফ্রক, একই রকম জুতো মোজা—তারা ঝপাঝপ সব পরে রেডি হয়ে নিলো, কিন্তু বেঁকে বসলো দুষ্টু। দুষ্টুর দুষ্টুমি শুরু হলো। বললো, সেও ঐ দিদিদের মতো ফ্রক পরবে। অথচ তার জন্যে দামী বেবি-সুট কেনা হয়েচে, তা সে পরবে না। সবাই মিলে বোঝানো হলো, তুই তো ছেলে, ছেলের ড্রেস পরবি। না, ঐ এক জেদ, দিদিদের মতো ফ্রক পরবে। শেষপর্যন্ত মিষ্টিরই একটা ছোটবেলাকার ছোট-হয়ে-যাওয়া ফ্রক দুষ্টুকে পরানো হলো, তবে ঠান্ডা! দুষ্টু তো দুষ্টুই। যাকগে, আজকাল তো ছেলেমেয়েরা একই রকম ড্রেস করতে শুরু করেচে।

তারপর এক বাক্স সন্দেশ আর ফুলের মালা কিনে নিয়ে তো বেরুনো গেল। কিন্তু ঠিক সময়ে পোঁছোনো গেল না। প্রথমত বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি, বাসের দেখা নেই। আবার যে বাসটা এলো পরে, তাতে ওঠে কার সাধ্যি! সব বাদুড়-ঝোলা হয়ে চলচে। আমি একগন্ডা কাচ্চা-বাচ্চাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা জ্ঞান দিলো, পরের বাসে, পরের বাসে। একবার ভাবলাম বলি, এটাও তো পরের বাস, নিজের বাস নাকি ? তাছাড়া কয়েকটা বাসের পরের বাসই তো!

যাকগে, তার পরের বাসেও পারলাম না উঠতে। তার পরের বাসে যাহোক ওঠা গেল। কিন্তু বাস খানিকটা গিয়ে আর এগোলো না। ভিড়ে গেল আটকে। বর্ষা বললো, চলো বাড়ি ফিরে যাই। বৃষ্টি বললো, ওঁরা খাবার নিয়ে বসে থাকবেন যে। শুনে মিষ্টি বললো, আমার বড্ড খিদে পেয়েচে। দুষ্টু বললো, আমারও।

যাক, শেষপর্যন্ত নন্তেদার বাড়িতে পেঁছানো গেল। নন্তেদা আমাদের দেখে চেঁচিয়ে উঠলো, এই এতক্ষণে আসা হলো? সব্বাই খেয়েদেয়ে চলে গেল। এত দেরি কেন? আয় আয়। তোদের নিয়ে খেতে বসবো বলে আমিও খাইনি, খিদে পেয়ে গেচে।

ব্যাস, মিষ্টি বলে ফেললো, আমারও।

তখন বর্ষা বৃষ্টি দুজনে তাকে চিমটি কেটে দিলো। এই!

নন্তেদা বললো, দেখচিস! বেচারাদের মুখ শুকিয়ে গেচে!

আমি দেরিতে আসার কারণটা সব নন্তেদাকে বলতেই নন্তেদা বললো, ও, বুঝলাম এতক্ষণে! তা আমারও একবার এ রকম হয়েছিলো। তবে খুব জোরসে ম্যানেজ করেছিলাম!

শুনে বর্ষা বলে উঠলো, বলো না, বলো না গল্পটা।

নন্তেদা বললো হেসে, এখন নয়। খেতে বসে বলবো। আমি খেতে খেতে বলে যাবো, তোরা শুনে যাবি আর খেয়ে যাবি। মুখ বুজে শুনলেই ভাল হতো, কিন্তু তাহলে তো খেতে পারবিনে। ঘটনাটা এমনিতেই তো বিশ্বাস হবে না সহজে। কাজেই মুখে গরস তোলা ছাড়া জেরা করবার জন্যে মুখ খুললেই কিন্তু আমি থেমে যাবো। রাজি?

—রাজি।

নন্তেদা শুরু করলো গল্প খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে, আর আমরা শুরু করলাম খাওয়া আর শোনা।

নন্তেদা বলতে লাগলো—

সেদিনও আমার জন্মদিন। আমি তখন ছোট। বাবা মা দুজনেই গেচি সিমলায় বেড়াতে। বাবা বললেন, আজ তোর জন্মদিনে কী চাই বল্? আমি বললাম, ঘোড়ায় চড়ে সিমলার উঁচু পাহাড়টায় একবার ঘুরে আসতে চাই। শুনে বাবা বললেন, এখন বিকেল বেলায় গিয়ে কি ঘুরে আসতে

পারবি ? দেরি হলে যাঁদের খেতে বলেচি, সবাই বসে থাকবেন। বরং কাল যাস। আমি বললাম, কতক্ষণ আর লাগবে! যাবো আর আসবো। আর খিদেটাও বেশ হবে, খুব খাওয়া যাবে। বাবা বললেন হেসে, বেশ। এসো তবে তাড়াতাড়ি। বাবা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মেজর হয়েছিলেন কিনা। তাই আমার বীরের মতো আবদার শুনে মনেমনে বোধহয় খুশিই হয়েছিলেন।

আমি সিমলার কালিবাড়ির কাছ থেকে একটা ঘোড়া ভাড়া করলাম ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে। আমি আরো কয়েকবার ঘোড়া ভাড়া করেছিলাম, তাই ঘোড়াওলা আমাকে চিনতো। সে বললো, সাহাব, হাম আপকো সাথমে চলেঙ্গে। আমি বললাম, নেহি। তুম হিয়া বৈঠা রহো, হাম ঠিক টাইমমে আ যায়েঙ্গে।

আমি লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলাম। লাগাম হাতে নিয়ে বললাম ঘোড়াকে, চলো বাহাদুর! ঘোড়া চলতে লাগলো, উঁচু পাহাড়ে উঠতে লাগলো। আঁকা বাঁকা পথ। একদিকে পাহাড়ের দেওয়াল, আর একদিকে নীচু খাদ। একবার পড়লে হয়। গড়াতে গড়াতে একেবারে ছাতু। না, ছাতু নয় মাংসের ঢেলা। তবে পাহাড়ী ঘোড়া তো, ঠিক চলেচে। আমি চারধারের শোভা দেখতে দেখতে চলেচি। ক্রমে পাহাড়ের মাথায় আসতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। তা হোক। আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠেচে। কাজেই পথ চিনে যেতে অসুবিধে হবে না। আর যাবার পথে তাড়াতাড়িই নামবো ঢালু পথে। কাজেই আমার জন্মদিনের পার্টিতে ঠিক টাইম-মতোই পেঁছুবো।

কিন্তু মুস্কিল হচ্চে, লোকে ভাবে এক, আর হয় এক। পাহাড়ের মাথায় উঠে চারিদিকটা বেশ ভাল করে দেখলাম। দেখলাম, সিমলা সহরে আলো জ্বলে উঠেচে। যেন মনে হচ্চে, দেবতার পায়ের কাছে জ্বলচে পঞ্চপ্রদীপ। ভাবলাম এবার নামা যাক। পথে আবার একটা ঘন বন আছে। বাঘ-ভালুক থাকা অসম্ভব নয়। আমার জন্মদিনে আমাকে নিয়েই তারা না ফিষ্টি করে।

ঘোড়ায় চড়ে নামতে লাগলাম। ঘোড়া বেশ সাবধানেই নামছিলো। আমিও বেশ হুঁসিয়ার হয়েই বসেছিলাম। চাঁদের আলো থাকলেও গাছের আড়ালে পথ মাঝেমাঝে অন্ধকার হয়ে আছে। তেমনি এক অন্ধকার পথে

হঠাৎ এক কাণ্ড হলো। ঘোড়াটার সামনের পা একটা আলগা পাথরে পড়ায় ঘোড়া হড়কে পড়ে গেল পাশের খাদে। দুজনেই হুড়মুড় করে পড়লাম। রক্ষে, গাছের একটা খোঁচা-ডালে আমার প্যাণ্টের পেছনটা আটকে যাওয়ায় আমি সেই ডালে ঝুলতে লাগলাম। আর ঘোড়াটা আরো খানিকটা গড়গড়িয়ে পড়ে ঘাড় মটকে আটকে পড়ে রইলো আর একটা গাছের গোড়ায়। আমি তখন আমার গাছে চড়ক-গাছের মতো ঝুলচি! ভাগিস জিমন্যাস্টিক জানা ছিল। তাই আমার ন্যাস্টি অবস্থা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আরো নীচেয় ঘোড়ার দিকে নামলাম। গিয়ে দেখি, ঘোড়াটা মরে পড়ে আছে।

যাঃ! এখন যাই কী করে? এই রাতটা কাটাই কী করে? এখুনি হয়তো বাঘ ভালুক বেরুবে। নিজেকে বাঁচাই কী করে? এই সব ভাবতে ভাবতে ভয়ে রক্ত আমার হিম হয়ে এলো যেন। আবার বেশ ঠাণ্ডাও পড়চে মনে হলো। গায়ে গরম পোষাক থাকলেও ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম। অথচ ঠকঠক করে কাঁপলে তো চলবে না, একটা কিছু করা দরকার। আমি মরা ঘোড়ার ল্যাজটাকে ধরে টানতে টানতে পাহাড়ী পথে এনে ফেললাম। তারপর একটা গাছের ডাল ভেঙে ছুঁচলো দিকটা ঘোড়াটার পেটের ভেতর ঢুকিয়ে লম্বা টান মেরে তার পেটটা ফেললাম চিরে। তার নাড়ি-ভুঁড়িগুলো টান মেরে টেনে ছিঁড়ে বার করে—নিজে তার পেটের মধ্যে গুড়িসুড়ি মেরে বসলাম। শীতের হাত থেকে তো বাঁচতে হবে! নইলে তো জমে যাবো।

ঘোড়ার চামড়ার লেপ গায়ে দিয়ে বসে আছি তো আছিই। বাইরে ঘোড়ার নাড়ি-ভুঁড়িগুলো পাহাড়প্রমাণ পড়ে আছে। দুর্গন্ধ বেরোচ্চে। আর মশা কামড়াচ্চে হরদম। ডাঁস মশা, ঠাস ঠাস করে মারচি। এমন সময় খস খস শব্দ। চেয়ে দেখি, সর্বনাশ, দু দুটো নেকড়ে বাঘ এসে হাজির। বোধহয় নাড়ি-ভুঁড়ির গন্ধ পেয়ে। গেলাম। আর রক্ষে নেই। আমি ঘোড়ার পেটের মধ্যে আরো সেঁদিয়ে বসে নিজেকে ঢাকা দিয়ে দুর্গা নাম জপতে লাগলাম। নেকড়ে দুটো সামনেই সুখাদ্য পেয়ে ফিস্টি করতে লেগে গেল। এমন সময় আমার মাথায় এক বুদ্ধি এলো। আমি তাক করে রইলাম। যেই নেকড়ে দুটো আমার দিকে পেছন ফিরেচে, অমনি খপ করে দু'হাতে তাদের দুটো ল্যাজ চেপে ধরলাম। ব্যাস! তারা চমকে গিয়ে পড়িমরি করে ছুটতে লাগলো—আমাকে সুদ্দু টেনে নিয়ে। আমি

ঘোড়াটাকে চিৎ করে নিয়ে ভাল করে বসে তাদের ল্যাজ ধরে ডাইনে বাঁয়ে চালাতে লাগলাম—যাতে ভুল পথে না যায়। বরফের উপর শ্লেজ যেমন চলে, তেমনি ছেঁচড়ে ছুটতে লাগলো আমার ঘোড়ার রথ। টানতে লাগলো দুই নেকড়ে! ক্রমে এসে পড়লাম বাড়ির কাছে।

বাবা আর অতিথিরা ওদিকে খুব চিন্তিত। বাবা তাঁর দু'নলা বন্দুক নিয়ে ভাবাচন, তাঁর ছেলেকে খুঁজতে বেরুবেন কিনা। এমন সময় দেখেন তাঁর বাহাদুর ছেলেই অদ্ভুত রথ চালিয়ে সাঁ সাঁ করে এগিয়ে আসচেন। তিনি ব্যাপারটা বুঝে আর দেরি না করে বন্দুক ফায়ার করলেন। সঙ্গেসঙ্গে নেকড়ে দুটো একই সঙ্গে কাত। আর রথ ঠিক বাবার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বাবার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলাম।···

বলেই নন্তেদা বললো, ও কীরে, তোরা হাত তুলে বসে আছিস? খা, খা।

লেডিজ মোজা

নন্তেদা তার বল্ডউইন হেয়ার টনিকের অমন চলতি কারবার উঠিয়ে দিলো। কারণ জিগ্যেস করায় বলেছিলো, নাঃ, ফোর-টোয়েণ্টি করে লোক ঠকাতে চাইনে। তাই উঠিয়ে দিলাম কারবার! তবে দেখিয়ে দিলাম, ফোর-টোয়েণ্টির ব্যাপারেও আমি কম নই।

তারপর আর অনেকদিন নন্তেদার দেখা নেই। তবে শুনেছিলাম, কী কাজে যেন নেপালের দিকে বনজঙ্গলেই কাটাতে হয় তাকে। তবে মাঝেমাঝে কলকাতায় আসে ছুটি নিয়ে। বলে, শহরের লোকেরা যেমন রেগেমেগে বলে, ধুত্তোর, বনে চলে যাবো, আমারও ঠিক তেমনি হয়। রোজরোজ বনজঙ্গল আর বাঘ-ভালুক দেখে দেখে চোখটা যখন পচে যায়, মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়, তখন পালিয়ে আসি কলকাতায় এই মানুষের ভিড়ে! বেশ ক'দিন সিনেমা থিয়েটার জলসা ক্রিকেট ফুটবল ম্যাচ দেখবার পর মেজাজটা ভাল হয়, চোখ দুটো বাঘ-ভালুকের চোখের মতোই জ্বলজ্বল করে ওঠে—আর তাদের জন্যে মনটাও যেন কেমন-কেমন করে, তখন আর ভাল লাগে না কলকাতা—তাই চলে যাই আবার বনে।

সেই নন্তেদাকে হঠাৎ দেখা গেল বছরখানেক পরে। আবার কলকাতায় এসেচে বোধহয় মেজাজ ভাল করতে, পচা চোখ দুটোকে তাজা করতে।

সেদিন হঠাৎ নন্তেদাকে অনেকদিন পর দেখতে পেয়ে আমরা ক'জন তাকে চেপে ধরলাম ঃ নন্তেদা, তোমার বনজঙ্গলের গল্প বলো।

পটলা বললো, হ্যাঁ নন্তেদা, বনজঙ্গলের গল্প বলো, শুনি আমরা।

আমি বললাম, বেশ নতুন গল্প হওয়া চাই কিন্তু।

হাবুল বললো, এমন গল্প বলবে যে আমাদের তাক লেগে যাবে।

শুনে নন্তেদা একটি সিগ্রেট ধরিয়ে বললো, দ্যাখ, গল্প-গল্প করিসনে। গল্প মানেই বানানো গল্প—এই যাকে বলে মনগড়া কিছু। আমি ওসবের

মধ্যে নেই। আমার কাছে সব সত্যি ঘটনা। তবে হ্যাঁ, বলতে পারিস গল্প হলেও সত্যি।

পটলা দেখলো নন্তেদা যেন একটু গরম হয়ে গেচে, তাই তাকে ঠান্ডা করবার জন্যে বললো, আমরা সত্যি ঘটনাই তো শুনতে চাই।

আমিও বললাম, আর সত্যি ঘটনাই অনেক সময় গল্পের মতোই মনে হয়।

শুনে নন্তেদা যেন খুশিই হলো ঃ হ্যাঁ, যাকে বলে সত্যি হলেও গল্প।

হাবুল একটু অধৈর্যগোছের ছেলে। বললো, নন্তেদা, শুরু করো।

—দাঁড়া, আগে সিগ্রেটটা শেষ করি। বলেই নন্তেদা বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই সিগ্রেটটা টানতে লাগলো চোখ বুজে।

আর আমরা তিনজন চোখ ড্যাবড্যাব করে তার সিগ্রেট-পোড়া দেখতে লাগলাম। কতক্ষণে সিগ্রেটটা পুড়ে যায়!

খানিক পরে হাতের পোড়া সিগ্রেটটা ফেলে দিয়ে নন্তেদা চোখ মেলে বললো, আছে তো অনেক ঘটনা, কোনটা বলি ভাবচি—

—তোমার যেটা ইচ্ছে। হাবুলের ঐ তাড়াহুড়ো।

আমি বললাম, যেটা সব চাইতে ভাল।

—তবে শোন—

আমরা তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে বসলাম।

নন্তেদা বললো, এই গত শীতের সময়কার ঘটনা। বেশ শীত পড়েচে। আর বনজঙ্গলের শীত তো—একেবারে হাড়কাঁপানো শীত! সে যে কী শীত এই কলকাতায় বসে তোরা তা বুঝতেই পারবিনে।

—কী রকম? পটলা জিগ্যেস করলো।

—এই যেমন সব সময় অগ্নিময় হয়ে থাকতে হয়। চলতে ফিরতে উঠতে বসতে, এমন কি শুতেও আগুন দরকার।—নন্তেদা বুঝিয়ে দিলো ঃ মাটির ভাঁড়ে কয়লার আগুন করে তাই দড়ি বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হয়।

—পুড়ে যাবার ভয় থাকে না? হাবুল জিগ্যেস করলো।

—থাকে বৈকি! অসাবধান হলে পুড়েও যায়।

আমি জিগ্যেস করলাম, তুমিও ঐ রকম আগুন নিয়ে ঘুরতে নাকি?

—নাঃ! আমার রক্তটা গরম বোধহয়।

পটলা বললো, চামড়াটাও বোধহয় মোটা—

—গণ্ডারের মতো। হাবুল যোগ দিল।

আমি ধমক দিলাম ঃ যাঃ ! কী বলচিস ! কাকে কি বলতে হয় জানিসনে ! ওতে গালাগালি দেওয়া হয় ।

কিন্তু নন্তেদা দেখলাম রাগ করলো না, বরং হেসেই বললো, হাবুল ঠিকই বলেচে । গণ্ডারের বিষয়ে ওর জ্ঞান আছে দেখচি । গুড !

পটলা বললো, যাকগে, গল্পটা বলো—

—ফের গল্প ? নন্তেদা ধমক দিলো ।

—না, না, সত্যি ঘটনাটা । শুধরে নিলো পটলা !

নন্তেদা বললো, আমি তো আগুন সঙ্গে রাখতামই না, এমন কি, হাতে গ্লাভস বা পায়ে মোজাও পরতাম না । কিন্তু গতবারের নেপালের শীত আমাকেও কাত করেছিলো বটে !

—তাই নাকি ? উৎসুক হলাম আমি ।

নন্তেদা বললো, এক রাত্রে তো শীতের চোটে ঘুম ভেঙে গেল । অথচ গায়ে তিন-তিনটে তিব্বতী কম্বল । ভাবলাম, নাঃ, এবার পায়ে মোজা চড়াতেই হলো । খেয়াল হলো পায়ের কাছেই তো আমার একজোড়া উলের হাফ-মোজা রাখা আছে । পরা যাক । ঘুমের ঘোরেই উঠে বসে মোজা একপাটি নিয়ে পায়ে দিতে গিয়ে দেখি মোজাটাও ঠাণ্ডায় শক্ত হয়ে গেচে । যাক, সেটি পায়ে পরিয়ে দু'হাতে ওপর দিকে টানতে গিয়ে দেখি হাফ-মোজা ফুল-মোজা হয়ে যাচ্চে । যেন লেডিজ মোজা । এ কী রকম হলো ! অথচ কাছাকাছি মাইল তিনেকের মধ্যে মেয়েমানুষের নামগন্ধও নেই ! কী ব্যাপার ! মোজাটা ঠাণ্ডায় বেড়ে গেল নাকি ?

আমি তাড়াতাড়ি বিজ্ঞানের জ্ঞানটা ফলাতে গেলাম ঃ কিন্তু নন্তেদা, বিজ্ঞানে বলে গরমে জিনিস বেড়ে যায়, ঠাণ্ডায় কমে যায় ।

নন্তেদা বললো, ঠিকই বলেচিস । এ দেখলাম তার উলটো । ঠাণ্ডা মোজাটা বেড়েই চলেচে । আরো টানতেই ফুল-মোজা একেবারে লেডিজ মোজা হয়ে গেল—একেবারে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত চলে এলো ।···এবার সন্দেহ হলো, এ কী রকম ব্যাপার ! মাথার কাছেই রাখা একহাত লম্বা আট-ব্যাটারীর টর্চ ছিল, জেবলে দেখি—সর্বনাশ, একটা পায়থন সাপের মুখের মধ্যে ডান পা-টা ভরে দিয়ে তার দুই ঠোঁট ধরে টানচি ।

—বলো কি ! আঁতকে উঠলাম আমি । আর সকলেও ।

—তারপর ? গলা শুকিয়ে গেচে হাবুলেরও ।

—ইস্ ! কী ভয়ানক ! বললো পটলা ।

—তখন কি করলে তুমি ? শুকনো গলায় জিগ্যেস করলাম ।

—কী আবার করবো ? নন্তেদা বললো, অমন শীতে এমন একটা মোজা পেয়ে ছাড়ি কখনো ! শুনেচি, অনেক সময় এরা জোড়ায়-জোড়ায় থাকে । নিশ্চয়ই আর একটাও কোথাও ঘাপটি মেরে আছে । এটার খোঁজে আসবে হয়তো !

—উঃ ! খুব সাহস তো তোমার । পটলা বললো ।

নন্তেদা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললো, আমি তাড়াতাড়ি টর্চটা নিবিয়ে দিয়ে পায়থনের মোজাটা খুলে সেটা আমার বালিশের তলায় লুকিয়ে চেপে রেখে শুয়ে থাকলাম চুপ করে অন্ধকারে ।

—তারপর ? আমাদের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হবার যোগাড় ।

তারপর নন্তেদা আর একটা সিগ্রেট ধরালো গম্ভীর হয়ে ।

হাবুল তাড়াতাড়ি বললো, নন্তেদা, এখন তোমার সিগ্রেট ফোঁকা রাখো । আমি তোমাকে আমার টিফিনের পয়সা দিয়ে একবাক্স ভাল সিগ্রেট কিনে দেবো । এখন বলো, তারপর কী হলো—

নন্তেদা গম্ভীর হয়ে বললো, দাঁড়া, একটু অপেক্ষা কর্ ।

অগত্যা মুখ বুজে অপেক্ষা করতেই হলো ।

নন্তেদা সিগ্রেটে আরো দু'চারটে টান দিয়ে বললো, অন্ধকারে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতেই মনে হলো পায়ের কাছে কী যেন একটা নড়চে । বুঝলাম, এসে গেচে জোড়ার আর একটা । আর দেরি না করে দু'হাতে দু'নম্বরের পায়থনটারও ঠোঁটদুটো ফাঁক করে তাতে ভরে দিলাম আমার বাঁ পা-টা । আর আশ্চর্য, দেখা গেল এটাও আগের সাইজের । পরে বালিশের তলা থেকে আগের পায়থনটাকে বার করে ডান পায়ে আবার পরে দিব্যি ঘুম লাগানো গেল আরাম করে ।

নন্তেদার গল্প, থুড়ি, সত্য ঘটনাটা শুনে আমরা সবাই হাঁ হয়ে গেলাম । বেশ খানিকটা পরেই আমাদের মুখ দিয়ে রা বেরুলো ।

বললাম, নন্তেদা, ঐ মজার মোজা জোড়া সঙ্গে করে আনলে না কেন ?

শুনে হাসলো নন্তেদা ঃ ঐ পায়থনের মোজা জোড়া আমার কাছেই ছিল এতদিন । কিন্তু মাঝে টাকার খুব টানাটানি হলো । কাজেই, কাছেই পাহাড়ী রাজা গারোমান্ডোর রানীর কাছে মোজা জোড়া চারশো বিশ টাকায় বিক্রি করে দিলাম । ঐ লেডিজ মোজা দিয়ে আমার কি হবে বল্ ? তোরাই বল্ ?

কথা—বরফ

এই তো কয়েকমাস আগেকার কথা।

নন্তেদা আমাকে আলাদা ডেকে বললো, এই চল কোথাও বেড়িয়ে আসি।

দলের মধ্যে নন্তেদা আমাকে একটু বেশিই ভালবাসে।

কিন্তু কোথায় ?—জিগ্যেস করতেই তেতে উঠলো নন্তেদা। বললো, যমের বাড়ি, যাবি ?

কাজেই আর কথা না বাড়িয়ে বললাম, চলো।

নন্তেদা এবার আমাকে সাবধান করে দিলো ঃ আর ঐ পটলা গোপলা, হেবো গেবো, নেড়ু কেরু, গদাই ছানা—কাউকে কিছু বলবিনে। ওরা বড্ড গণ্ডগোল করে। তাতে কাজ সব কেঁচে যায়।

—তা আমাকে যে তুমি বেছে নিলে বড় ? বেশ উৎসুক হয়েই কথাটা জিগ্যেস করি।

নন্তেদা হেসে বললো, ঠিক করেচি তোকে আমার লেফটন্যাণ্ট বানাবো। যাকে বলে প্রধান শিষ্য। প্রধান শিষ্য না থাকলে প্রচার হয় না ভাল।

অতএব একদিন নন্তেদার সঙ্গে অজানার পথে রওনা দিলাম।

নন্তেদা দেখি, আমাকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে একটা ট্রেনের ফার্স্টক্লাসে উঠলো।

কোথায় যাচ্চি, কোন ট্রেনে যাচ্চি—তা আর জিগ্যেস করতে ভরসা পেলাম না। তবে সাহস করে জিগ্যেস করলাম, ফার্স্টক্লাস যে !

নন্তেদা গম্ভীর হয়ে বললো, ফার্স্টক্লাস লোকদের চেনবার জন্যে। আগে থার্ডক্লাসে চড়ে থার্ডক্লাস লোকদের চিনেচি !

কথাটা কেমন বাঁকা-বাঁকা বললো নন্তেদা, তাই চুপ করে গেলাম। চুপচাপ দেখতে লাগলাম ফার্স্টক্লাস কামরাটা। বেশ ঝকঝকে, তকতকে কেবিন। কোন ভিড়-ভাড়াক্কা নেই, নীচেয় দুটো লম্বা সীট, তার উপরে

বাংক। বেশ চওড়া আর গদি আঁটা। কেবিনের দরজা বন্ধ করলেই রিজার্ভ করা যেন। বাথরুমের দরজায় একটা পথের ম্যাপ সাঁটা! আর মাথার উপরে ইলেকট্রিক পাখা আলো তো আছেই। বরং পাখাগুলো বেশ সচল, আর দেখলাম সীটের মাথায় আছে বাড়তি আলো, রীডিং ল্যাম্প!

হাঁ করে সব দেখতে লাগলাম। কারণ ফার্স্টক্লাসে চড়া এই আমার প্রথম। মানে, ফার্স্ট আমি কখনোই হইনি। ক্লাসে ফার্স্ট বেঞ্চেও বসিনি কোনদিনই। ট্রামেও সেকেন্ড ক্লাসেই চড়ি। কম পয়সায় একই সময়ে একই জায়গায় তো যাওয়া যায়। ভীড়? ফার্স্টক্লাসের ট্রামে ভিড় নেই?

ট্রেন ছাড়বে. এমনসময় হন্তদন্ত হয়ে এক সাহেব ব্যাগ হাতে ঢুকে পড়লেন আমাদের কামরায়। আমাদের দেখে মাথাটা একটু নুইয়ে নড্ করে বললেন, গুড্ মর্ণিং!

আরে মর্! কোথাকার ঝামেলা এসে পড়লো! তবু নন্তেদা ভদ্রতা করতে ছাড়লো না। আরো মাথা নুইয়ে নড্ করে বললো, মর্ণিং!

আমি মনে মনে বললাম, মোরনিং। শোক করচি, তুমি এসে পড়ায়।

তা নন্তেদা দেখি বেশ হাসিখুশি। হবেই তো। ফার্স্টক্লাস লোক চেনবার জন্যেই ফার্স্টক্লাসের টিকিট কেটেচে নন্তেদা। আমারও কেটেচে নিজের খরচায়।

সাহেব সামনের সীটে বসলেন জাঁকিয়ে। তবে তাঁর সাজ-পোষাকে তাজ্জব বনে গেলাম আমরা, অন্তত আমি। তখন গরমকাল, মাথার উপরে পাখা চলচে বনবন করে—আর সাহেবের পরনে কিনা মোটা উলেন স্যুট। শুধু তাই নয়, গায়ে ওভারকোট, মাথায় টুপি! ভেপসে যাচ্চেন না সাহেব?

আমি চুপচাপ দু'চোখ দিয়ে গিলতে লাগলাম সাহেবকে। নন্তেদা থাকতে আমার ওপর-পড়া হয়ে কিছু জিগ্যেস করাটা ঠিক হবে না। হয়তো একটা ধমক দিয়ে আমার প্রেস্টিজ পাংচার করে দেবে। তাছাড়া ইংরেজিটাও আমার আসে না তেমন!

তা নন্তেদা-ই জিগ্যেস করলো সাহেবকে: ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড স্যার, আর ইউ নট ফিলিং হট? তোমার গরম লাগচে না?

সাহেব তার উত্তরে যা বললেন, বাংলাতেই বলি—

সাহেব বললেন, উপায় কি?

—কেন ?

সাহেব হেসে বললেন, আমার এই একটা মাত্রই স্যুট। নর্থ পোলে থাকি কিনা, তাই এই মোটা ধক্কড় পোষাক-আশাক।

—কষ্ট হচ্চে না ? নন্তেদার প্রশ্ন।

সাহেব আবার হাসলেন, কষ্ট ? হ্যাঁ, কষ্ট হচ্ছিলো প্রথম-প্রথম। তোমাদের দেশটা বেশ গরম তো ! তবে একটা সুবিধে হয়ে গেচে। গায়ে গরম পোষাক থাকায় ভেতরে খুব ঘামচি। আর ঘামের জলে শরীরটা বেশ ভিজে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে ! তাছাড়া ঘামটাও বেশ এনজয় করচি। নর্থ পোলে এই ঘাম-টামের কথা কেউ জানেই না। খুব রোমাঞ্চকর, ইজ ইণ্ট ইট ?

সাহেবের গরম পোষাক দেখে আমি আগেই ঘামতে শুরু করেছিলাম, এবার তাঁর রোমাঞ্চকর ঘামের কথা শুনে আরো যেন ঘামতে লাগলাম।

তবে নন্তেদা ঘামবার পাত্র নয়। তাই গম্ভীর হয়ে বললো, কথাটা ঠিকই বলেচো। এই ঘাম বস্তুটা আমাদের বেঙ্গলেরই একচেটিয়া ব্যাপার। যাকে বলে বেঙ্গলী সন্দেশ রসগোল্লার মতোই। ইণ্ডিয়ায় আর কোথাও এমন ফার্স্ট ক্লাস ঘাম আর সন্দেশ রসগোল্লা পাবে না। আমরাও ঘাম ঘুম আর ঐ স্পেশাল সুইটস খুব এনজয় করি। তবে ঘামটা এত এনজয় করি যে, ঐ ঘাম ম্যানুফ্যাকচারিং-এর জন্যে এসময়ে ঐ গরম পোষাক ব্যবহার করিনে।

—আর 'ঘুম' কি বললে ? সাহেবের প্রশ্ন।

—ঘুম, ঘুম, দিবানিদ্রা। নন্তেদা বেশ জোর গলায় বললো, এটাও বেঙ্গলের একটা স্পেশালিটি !

নন্তেদা স্রেফ চেপে গেল, গরমে রাত্রে ঘুম না হবার জন্যেই সুযোগ পেলেই অনেককেই দিবানিদ্রার আশ্রয় নিতে হয় !

সাহেব বললেন, ইউ আর লাকি। নর্থপোলে নো ঘাম, নো ঘুম, নো—কী বললে ?

—সন্দেশ রসগোল্লা !

—ইয়েস ইয়েস, সণ্ডেশ রাস্‌গুল্লা !

নন্তেদা এবার কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলো, তা স্যারের নর্থপোলে কি করা হয় ? চেহারা দেখে তো নর্থ পোলের লোক বলে মনে হয় না।

শুনে সাহেব জোরে হেসে উঠলেন এবার, ঠিক, ঠিক, ঠিক ধরেচো তুমি। রাইট ! তুমি খুব ইনটেলিজেণ্ট দেখচি।

ইনটেলিজেন্ট ?—আর একটু হলেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, আমাদের মতো এমন কুচুটে বুদ্ধিও কোথাও পাবে না তুমি। এটাও আমাদের স্পেশালিটি !—কিন্তু চট করে মুখে ব্রেক কষে দিলাম।

সাহেব বলতে লাগলেন, মানে, নর্থপোলে আমার খুব কষ্টই হয়। বরফের চাং দিয়ে তৈরী গোলাকার বাসা ইগলুতে থাকতে হয়, ঢুকতে হয় হামাগুড়ি দিয়ে। খাওয়ার মধ্যে বলগা হরিণের মাংস পুড়িয়ে খাওয়া। আর নয়তো চারধারের জমা বরফের বিশেষ একটা জায়গার খানিকটা ভেঙে তার তলার জলে ছিপ ফেলে মাছ ধরা আর সেই মাছ পুড়িয়ে খাওয়া। সেটা তো রীতিমত ফিস্ট।

নন্তেদা জিগ্যেস করলো, তা এত কষ্ট করাই বা কেন ?

—রিসার্চ ! রিসার্চ ! সাহেব উত্তর দিলেন, আমি রিসার্চ করি।

—কি নিয়ে রিসার্চ, জানতে পারি কি ? নন্তেদা উৎসুক হলো। আমিও।

সাহেব বললেন, বরফ, কথা, আর আগুনের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক ও তার পরিণতি—এই নিয়ে।

—কী রকম ? নন্তেদা আরও কৌতূহলী। এবং আমিও।

সাহেব দু'হাত নেড়ে বললেন, নর্থপোলে নভেম্বর-ডিসেম্বরে শীতের সময় কথা বলা মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায়। এই ধরো, তুমি কথা বলচো, তোমার মুখ দিয়ে বাষ্প বেরুচ্চে, আর সে কথাগুলো ঠাণ্ডায় সঙ্গে সঙ্গে জমাট বরফ হয়ে নীচেয় পড়চে। তুমি যত কথা বলবে, তোমার সামনে তত কথার বরফ জমতে থাকবে। কাজেই সামনেই তুমি যার সঙ্গে কথা বলচো, সে একটা কথাও শুনতে পাচ্চে না।

সাহেবের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম, তাই নাকি ? তাড়াতাড়ি নন্তেদার মুখের দিকে চাইলাম। দেখলাম, তার মুখেও সন্দেহের ভাব। বুঝলাম, নন্তেদা বিশ্বাস করেনি সাহেবের কথা। না করবারই কথা। নন্তেদা বরাবর বাইরে-ঘোরা ভবঘুরে লোক, তাকে যা-তা বোঝালে বুঝবে কেন ? ইগলু, বলগা হরিণ, বরফ ভেঙে তলার জলে মাছ ধরা—এসব তো আমিও জানি, সকলেই জানে। তা বলে ঠাণ্ডায় কথা জমে যাওয়া ? নন্তেদার মুখের ভাব দেখে আমারও মনে হলো, সাহেব গুল মারচেন। সাহেব হয়তো নর্থপোলের সরল লোকগুলোর মাথায় হাত

বুলিয়ে কোন কিছু সন্তায় কিস্তিমাত করেন, আর সে সব কথা গোপন করে ঐ সব বাতেলা মারচেন।

নন্তেদা কিন্তু কোনরকম ভাবাবেগ না দেখিয়ে বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেচি বটে কথাটা।

সাহেব নন্তেদা-র কথায় উৎসাহ পেয়ে বললো, আমি তাই ঠিক করেচি, নর্থপোলে কারোর কথা টেপ-রেকর্ডিং করবার দরকার নেই। ঐসব কথা-বরফের টুকরোগুলো কোন থার্মোফ্লাস্ক জাতীয় পাত্রে রেখে পরে ইলেকট্রিক হিটারে গরম করলেই জমা কথাগুলো ঠিকঠিক মত শোনা যাবে। জানো, এই কাজে অনেকটা সাকসেসফুলও হয়েচি।

শুনেই নন্তেদা ফুলফোর্সে তড়াং করে উঠে দাঁড়িয়ে সাহেবের লাল হাতখানা ধরে কষে হ্যাণ্ডশেক করলো, আরে মিষ্টার, তুমি বলো কি? আমিও তো ঐ রকম ব্যাপার নিয়েই রিসার্চ করচি। তবে আমার সাবজেকটটা তোমারটার ঠিক অপোজিট, উল্টো।

—কী রকম? কী রকম? এবার সাহেবের অবাক হবার পালা। আর হ্যাঁ, আমারও। নন্তেদা রিসার্চ করচে? কই, না তো! তবু মুখ চেপে, মুন চেপে,, চুপচাপ চেপে বসে রইলাম। ওদের রিসার্চ ব্যাপারটা বেশ সরস হয়ে উঠবে মনে হচ্চে।

নন্তেদা গম্ভীর হয়ে বললো, আমরা সেই জন্যেই তো ডেজার্টে যাচ্চি, মরুভূমিতে! থর ডেজার্টে!

ডেজার্টে! রাজপুতনার থর ডেজার্টে! চমকে উঠলাম আমি।

নন্তেদা তেমনি গম্ভীর হয়ে বললো, এখানকার ডেজার্টে ঐ একই রকম অসুবিধে। খুব গরম তো! তাই সেখানে কেউ কোন কথা বলতে গেলেই কথাগুলো গরমে গলে জল হয়ে গলগল করে পড়তে থাকে বালিতে, আর সে সব তরল-কথাগুলো শুষে নেয় বালি। কাজেই অনেক দরকারি কথা নষ্ট হয়ে যায়। তাই রাজপুতানা গভর্নমেণ্টের অনুরোধেই আমরা—

সাহেব আর কোন কথা না বলে গুম হয়ে বসে রইলেন। নন্তেদা একটু থেমে বললো, তুমি হয়তো ভাবচো, কথা-জল থেকে কথা বার করবো কি করে? খুবই ইজি। কথা-জলগুলো জমা করে রেফ্রিজারেটরে রেখে বরফ করে জমিয়ে দেবো। আর তারপর তোমার পলিসি। তবে এখানে ইলেকট্রিক হিটারের দরকার হবে না, দরকারমত রোদ্দুরে ঐ কথা-বরফ গলালেই কথা

জল হয়ে গলগল করে বেরুতে থাকবে। তবে আমাদের এক্ষেত্রে একটা মজার ব্যাপার ঘটবে। কথাগুলো যখন ঝরঝর করে ঝরে পড়বে ঝর্ণার মতো তখন মৃদু-মধুর আওয়াজ বেরুবে, যেন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক।···কী সাহেব, হোয়াট ডু ইউ থিংক?

সাহেব তবু কোন কথা না বলে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন।

নন্তেদা বললো, আমার এই রিসার্চটার কপি-রাইট নিয়ে সৌদি আরেবিয়ার রাজাকে চিঠি দেবো ভেবেচি,—বলবো, তোমরা যদি ইন্ডিয়ায় পেট্রোলের দাম কম করো, তবে আমার এই রাইট তোমাদের দিতে পারি। হ্যাঁ সাহেব, ভাল হবে না?

ঠিক সেই সময় কোন একটা স্টেশনে ট্রেনটা থামতেই সাহেব এতক্ষণে কথা বললেন, 'গুড বাই'।

আর সঙ্গেসঙ্গে নেমে গেলেন তিনি।

আমি জানলায় মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, বর্ধমান।

মেক্সিকান টুপি

নন্তেদা সেদিন আমাদের এক আড্ডায় এসে ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে বললো, নাঃ, এভাবে আর চলে না।

বলেই থেমে গেল।

নন্তেদার ঐ এক দোষ। কথা কিছুতেই শেষ করবে না। একটু ধরিয়ে দিয়ে সুতো ছিঁড়ে দেবে। তখন আমাদেরই হৈহৈ করতে হয়, তারপর? তারপর? কেন? কেন?

—কেন, কী হলো? জিগ্যেস করলাম।

—কেন আবার! নন্তেদা খিঁচিয়ে উঠলো, কলকাতার সহরে বাসে ট্রামে আর চলা যায় নাকি? দেখিস না কী কাণ্ড!

—সে তো দেখি! সবাই বললাম।

নন্তেদা বললো, আজকাল দুর্ভোগ যেন আরো বাড়চে। অর্ধেক দিনই তো বাস বা ট্রাম বন্ধ। আবার বেশির ভাগ বাস বা ট্রাম ডিপো থেকেই ছাড়ে না। ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। সব ডিসপোজালের মাল তো। আর যদিও চললো, তাও ঠোক্কর খেতে খেতে। রাস্তায় বড় বড় গর্ত, সামনে লম্বা মিছিল কিংবা কোন পাড়া বন্ধ, কোন রাস্তায় বা পথরোধের ব্যবস্থা—বড় বড় ড্রাম দিয়ে আটকানো।

সত্যিই! আহা, মনের কথা বলেচে নন্তেদা।

—দেখেচিস্—নন্তেদা বলতে লাগলো, বাসে ট্রামে লোকগুলো কী ভাবে ঝোলে? বাসের পেছনের বাম্পারেও লোক দাঁড়ায়। বাসের মাথাও বাদ যায় না।···আর বাস-ট্রামের ভেতরের অবস্থাটা? একদম চিঁড়ে-চ্যাপ্টা ব্যাপার। গরমকালে ঘামে ঘামে জেবড়ে যেতে হয়।···নাঃ, এভাবে আর চলে না।

পুষন বললো, নিজের একটা মোটরসাইকেল, বা স্কুটার থাকলে তবু খানিকটা সুরাহা হয়।

শুনে নন্তেদা তেড়ে উঠলো, আরে বাবা, হয় তো জানি। কিন্তু তার আগে যে একগাদা টাকা বার করতে হয়! তাছাড়া কলকাতার রাস্তায় ঐসব চালাবার জায়গা আছে নাকি?

—তা তো বটে। পুষ্কর সায় দিলো।

প্রচেত বললো, আর উপায়ই বা কি?

নন্তেদা বললো, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।

আমি বললাম, মাটির তলা দিয়ে তো শীগ্রী রেল চলবে, আর ভাবনা কি?

—ভাবনা? ভাবনা আমার জন্যেই। নন্তেদা গম্ভীর হয়ে বললো, অতদিন বাঁচলে বাঁচি। এখন তো খবরের কাগজে পাতাল-রেলের বড় বড় বিজ্ঞাপন দেখি আর দিল খোস করে রেখে দোলা খাই!···নাঃ, ভাবছি ম্যাডাগাস্কার চলে যাবো।

শুনে আমরা সবাই একসঙ্গে আঁতকে উঠলাম: সেকি নন্তেদা, একদম ম্যাডাগাস্কার!

মনে মনে ভাবলাম, নন্তেদা ম্যাড হয়ে গেল না তো! হঠাৎ ম্যাডাগাস্কার!

নন্তেদা বললো, তাছাড়া উপায় কি? এখেনে ব্রেনের কোন দাম আছে? পয়সা খরচ করে বিদেশী ব্রেন-এর সাহায্য না নিলে কর্তাদের মন ভরে না। অথচ কত দেশী ব্রেন শুধু একটু সুযোগ বা সহানুভূতির জন্যে গড়াগড়ি যাচ্চে। কিন্তু আমাদের কর্তাদের ধারণা, সাহেব ছাড়া আর সবাইয়ের মাথায় গোবর পোরা—তাও ষাঁড়ের গোবর! আর সাহেবরা ষাঁড়ের ডালনা খায় কিনা—

বলেই নিজের মাথাটা দেখিয়ে বললো নন্তেদা, এই ধর্ না, আমারই ব্রেন—যাকে বলে বুদ্ধি, আইডিয়া—স্রেফ মাঠে মারা যাচ্চে। সাধে কী আর ম্যাডাগাস্কার যেতে চাইচি! ওখানে গেলে আমাকে লুফে নেবে ওরা।

এতক্ষণে বুঝলাম, নন্তেদা কিছু বলতে চায়। তাই এই সব ভূমিকা। কিন্তু কথাটা তো সোজাসুজি পরিষ্কারভাবে বলবে না, রেখে ঢেকে ডাঁট দেখিয়ে বলবে। জানি তো নন্তেদাকে! অথচ এমন এক-একটা কথা বলবে—যার শেষটুকু জানবার জন্যে আমাদেরই পেট ফুলতে থাকে। তখন বোমা মেরে মেরে নন্তেদার পেট থেকেই কথাটা বার করতে হয়, নিজেদেরই গরজে।

—কেন, যাতায়াতী সমস্যার বিষয়ে কোন আইডিয়া আছে নাকি তোমার? হ্যাঁ নন্তেদা? বললাম আমি।

—আছে বৈকি। হতাশ হয়ে নন্তেদা বললো, কিন্তু কে কার কথা শুনচে!

—যাক, অন্তত আমরা শুনি।

—শুনবি? তবে শোন। নন্তেদা যেন খুশিই হলো। বললো, কয়েক বছর আগে যখন মেক্সিকোতে গেছলাম—

অমনি বাধা দিলো পুষন: তুমি আবার মেক্সিকোতে কবে গেলে?

—ঐ তো। নন্তেদা হাত ঘুরিয়ে বললো, তোরাই আমার কথা বিশ্বাস করিসনে, তা সরকার কেন করবে? ঠিক আছে, যাক, অন্য গল্প হোক। বল্, তোদের সব খবর-টবর কি?

ইস। পুষন বুঝি সব গুপলেট করে দিলো। জানিস তো বাপু, নন্তেদা মাঝেমাঝে বলে মন্দ না, তবে একটু এদিক-ওদিক বলে, এই যা। কিছুটা বাদ-সাদ দিয়েও তো নিতে হয়। অনেক সময় ফিফটি-ফিফটি।

পুষ্কর আমার কানে কানে বললো, আমার মনে হয় নন্তেদা মেক্সিকোর কোন সিনেমা দেখে এসেচে।

—তুই চুপ কর্! পুষ্করকে থামিয়ে পুষনকে ধমক দিলাম, দ্যাখ্ পুষন, বাজে বকিসনে। নন্তেদা মেক্সিকোতে যেতে পারে না? আজকাল বিলেত আমেরিকা সব ডাল-ভাত হয়ে গেচে, জানিসনে? আজকাল সকালে কলকাতায় চা খেয়ে দুপুরে লণ্ডনে লাঞ্চ খাওয়া যায়—জানিস? মনে রাখিস, এটা চাঁদে যাবার যুগ।

শুনে পুযন মাথা চুলকে বললো, সরি, আমার ভুল হয়ে গেচে। তারপর?

নন্তেদা গম্ভীর হয়ে বললো, মেক্সিকোতে গিয়ে মেক্সিকানদের মাথায় টুপি দেখে আমার মাথায় ঘচাং করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

প্রচেত জিগ্যেস করলো, কী নন্তেদা?

নন্তেদা বললো, তোরা হয়তো সিনেমায় বা কোন পত্রিকায় দেখে থাকবি মেক্সিকানদের মাথার টুপিগুলো খুব বড় বড় সাইজের হয়—রোদ্দুর থেকে মুখ বাঁচাবার জন্যে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেচি, দেখেচি বটে সিনেমায়। সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম আমরা।

—আর টুপিগুলো যাতে হাওয়ায় উড়ে না যায়, সেজন্যে ওরা দুটো ফিতে দিয়ে চিবুকের তলায় বেঁধে রাখে। নন্তেদা আমাদের বুঝিয়ে দিলো: তবে

টুপিগুলো বেতের বা ওদেশী খড়ের তৈরী।

আমরা গিলতে লাগলাম নন্তেদার কথা।

নন্তেদা বলতে লাগলো, ঐ টুপি দেখে আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসে গেল। আমি তক্ষুনি বাজার থেকে একগজ প্যারাসুটের কাপড় কিনে নিয়ে সোজা চলে এলাম একটা টুপি তৈরীর দোকানে। গিয়ে বললাম, এই কাপড়ে একটা টুপি আমাকে তৈরী করে দাও—আর একটু বড় সাইজের। আর তার মধ্যে বেত ভাঁজ করে দেবে যাতে হাওয়ায় মুড়ে না যায়।

পুষন আবার বলতে যাচ্ছিলো, তুমি ওদের ভাষা—

আমি তাড়াতাড়ি পুষনের মুখ চেপে ধরলাম ঃ আঃ। চুপ কর্ না!

নন্তেদা যেন কথাটা শুনতেই পায়নি, এমন ভাব দেখিয়ে বললো, পরদিন দাম দিয়ে ছাতার মতো দেখতে প্যারাসুট-কাপড়ের টুপি নিয়ে সোজা ছুটলাম সমুদ্রের ধারে।

—সেখানে কেন? প্রচেতর প্রশ্ন।

—হাওয়ার জন্যে। সমুদ্রের ধারে খুব হাওয়া, জানিসনে? নন্তেদা বলতে লাগলো, সেখানে গিয়ে টুপিটা মাথায় প'রে, ফিতে বাঁধতে না বাঁধতেই হাওয়ায় আমি উপরে উঠে গেলাম, উড়তে লাগলাম। কিন্তু মুস্কিল হলো, ডাঙার দিকে না গিয়ে সমুদ্রের দিকে অনেকটা উড়ে গেলাম। তখন ভয় হলো মনে। এখন টুপিটা না উড়ে যায়। তাড়াতাড়ি ফিতের বাঁধনটা একবার চেক করে দেখে নিলাম। না, ঠিক আছে। তারপর বাঁ হাত দিয়ে টুপির ধারটা ধরে দেখতে গেলাম টুপিটা ঠিক আছে কিনা—

বলেই আচমকা থেমে গেল নন্তেদা। বললো, একটু চা খাওয়া। গলাটা শুকিয়ে গেচে।

নন্তেদার বিপদে আমাদেরও গলাটা যেন শুকিয়ে গেছলো। বিশেষ করে মাঝপথে গল্পটা থামিয়ে দিতে আমরাও যেন নন্তেদার মত অথৈ সমুদ্রের ওপরে ঝুলতে লাগলাম। প্রচেতই আমাদের মধ্যে ছোট, তাই তাড়াতাড়ি তাকে বললাম, যা, চট করে কেটলিতে করে পাঁচ কাপ চা আর পাঁচটা ভাঁড় নিয়ে আয়।

—আর আমার গল্প শোনা হবে না যে। প্রচেত বললো।

গম্ভীর হয়ে নন্তেদা বললো, গল্প নয়, বাস্তব। ভয় নেই, তুই যা। এই আমি চুপ করে বসে রইলাম।

প্রচেত তখনি চায়ের দাম আর কেটলি নিয়ে ছুটলো। আর ততক্ষণ নন্তেদা ওপরের দিকে মুখ তুলে পা নাচাতে লাগলো। মনে হলো, নন্তেদা যেন নিজেকেই দেখছে, টুপি পরে সমুদ্রের উপরে উড়চে।

একটু পরেই প্রচেত কেটলিতে চা আর ভাঁড় নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকে বললো, গল্প, থুড়ি, বাস্তব ব্যাপারটা শুরু হয়নি তো?

এতক্ষণে নন্তেদা কথা বললো, হ্যাঁ, বাস্তব ব্যাপারটা সেই মেক্সিকো-তেই হয়েছিলো।—দে, চা দে।

নন্তেদাকেই আগে একটা ভাঁড়ে করে চা দিলাম। নন্তেদা সেটা দু'তিন চুমুকে শেষ করে বললো, সমুদ্রের উপর উড়তে উড়তে টুপিটা ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্যে বাঁ হাত দিয়ে টুপির ধারটা ধরে দেখতে গিয়ে একটু চাপ পড়লো, দেখি আমি ওমনি বোঁ করে বাঁ দিকে ঘুরে গেলাম। ভাবলাম, বা রে, ব্যাপারটা তো মন্দ নয়। তখুনি ডান হাত দিয়ে টুপির ডান দিকটা একটু টেনে নীচের দিকে ধরতেই এবার আমি উড়তে উড়তে ডান দিকে ঘুরে গেলাম।

পুষ্কর বললো, বেশ তো মজা।

নন্তেদা বললো, ব্যাপারটা বুঝলিনে? পাখীদের ওড়া দেখিসনি? ওরা ডানাটা একটু ডাইনে বাঁয়ে বেঁকিয়ে ঐ মতো বাঁক নেয়। প্লেনেও ঐ একই রকম ব্যাপার।...যাক আমি তখন মোড় ঘুরে এলাম ডাঙার দিকে। পরে টুপির দু'ধারটা ওপর দিকে তুলে ধরতে টুপিতে হাওয়ার ধাক্কাটা কম লাগতে লাগলো, আমি আস্তে আস্তে নীচেয় নামতে লাগলাম।

প্রচেত বললো, বা-রে মজা।

—ওদিকে আরো মজার ব্যাপার ঘটলো, নন্তেদা বললো, আকাশ থেকে ঐ ভাবে নামতে দেখে মেক্সিকান সাহেব-মেমরা যারা কাছাকাছি ছিল, একদম হাঁ হয়ে গেল। পরে আমার কাণ্ড দেখে হৈ চৈ লাগিয়ে দিলো। আমি মাটিতে পা দিতেই তারা আমাকে জড়িয়ে ধরলো, আমাকে মাথায় তুলে নাচতে লাগলো। খবর পেয়ে খবরের কাগজ থেকে রিপোর্টার প্রেস-ফটো-গ্রাফাররা এসে জুটলো। মুখের সামনে মাইক ধরতে লাগলো আর ফ্ল্যাশ দিয়ে দিয়ে ফটো তুলতে লাগলো আমার। পরদিন সব কাগজে আমার ছবি আর জীবনী।

আমি আর না বলে পারলাম না : তার কাটিং আনোনি নন্তেদা?

—এনেছিলাম বৈকি। নন্তেদা বললো, বছরখানেক আগে দিল্লীতে যাচ্ছিলাম ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে একটা আলোচনা করতে। স্যুটকেসেই ঐগুলো সব ছিল। কিন্তু মোগলসরাইয়ের কাছে এসে দেখি স্যুটকেসটাই হাওয়া। কে যেন চক্ষুদান করেচে। মনের দুঃখে তক্ষুনি মোগলসরাইয়ে নেমে রিটার্ন টিকিট কেটে ফিরে এলাম কলকাতায়।

বলেই বললো নন্তেদা: অথচ জানিস, মেক্সিকান গভর্নমেন্ট আমাকে সাধাসাধি—তুমি কীভাবে আকাশে উড়লে আমাদের শিখিয়ে দাও। এজন্যে যত টাকা চাও দেবো। আমি বললাম, ইন্ডিয়ান মন্ত্রে ঐভাবে উড়েছিলাম। আমাদের ইন্ডিয়ায় এভাবে অনেকেই ওড়ে। নারদ ঋষি, হনুমান, পুষ্পক রথের কথা বললাম। আর বললাম, ওসব তো তোমাদের দ্বারা হবে না। তোমরা যে ষাঁড়ের ডালনা খাও!

আরো বললো নন্তেদা, জানিস, অত টাকার মায়া ছেড়ে দিলাম শুধু আমার এই আবিষ্কার দেশের উপকারে লাগাবো বলে। অথচ এরা আমার কথা কানেই তুললো না। হোপলেস্।

নন্তেদা চুপ করলো।

পুষন এবার জিগ্যেস করলো, একটা কথা জিগ্যেস করবো?

—কি? নন্তেদা যেন বিরক্ত।

পুষন ঢোঁক গিলে বললো, বলছিলাম কি, সমুদ্রের ধারে খুব হাওয়া ছিল বলে তুমি উড়তে পেরেছিলে। কিন্তু যেখানে তেমন হাওয়া নেই? ধরো এই কলকাতায়?

—সে এক্সপেরিমেন্টও হয়ে গেচে আমার।

জিগ্যেস করলাম, কী রকম?

নন্তেদা বললো, ভাবতে লাগলাম, জোর হাওয়া দরকার, অথচ কী করা যায়? একরাত্রে শুয়ে আছি, হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। সেরাত্রে আর ঘুম এলো না। ভোর হতেই ছুটলাম ঠনঠনে। সেখানে পুরোন যন্ত্রপাতির দোকানে গিয়ে কিনলাম একটা ছোট পেট্রোল ইঞ্জিন—এই যেমন মোটর-সাইকেলে লাগানো থাকে। ঐসব ইঞ্জিন পাম্পে লাগিয়ে জল তোলা হয়, ডায়নামোয় লাগিয়ে আলো জ্বালানো যায়। আমি মিস্ত্রী ডাকিয়ে ঐ ছোট্ট ইঞ্জিনে একটা ছোট ব্লোয়ার লাগিয়ে নিলাম। কারখানার কামারশালে হাওয়ার জন্যে ঐরকম ব্লোয়ার দরকার হয়। তারপর চালিয়ে

দিলাম ইঞ্জিন, হুহু করে ব্লোয়ারের মুখ দিয়ে হাওয়া বেরুতে লাগলো।

পুষ্কর জিগ্যেস করলো, তারপর ?

—তারপর ? নন্তেদা হেসে বললো, একদিন রাত্রে যখন সবাই ঘুমোলো, সারা কলকাতা নিস্তব্ধ, সেই গভীর রাত্রে সেই মেক্সিকান টুপি আর ছোট পোর্টেবল ব্লেয়ার-সেট নিয়ে ছাদে উঠলাম। টুপিটা পড়লাম মাথায় আর ব্লোয়ার-সেটটা বেল্ট দিয়ে পিঠে বাঁধলাম। ব্লোয়ারের মুখটা রাখলাম টুপির দিকে। ব্যাস।

—ব্যাস্ মানে ? কী হলো ? প্রচেত অবাক।

—কী আবার। নন্তেদা হেসে বললো, ইঞ্জিনটা চালিয়ে দিতেই হুহু করে হাওয়া এসে ধাক্কা দিতে লাগলো টুপিতে, আর আমি উঠতে লাগলাম, উড়তে লাগলাম। টুপির ধার বেঁকিয়ে অন্য বাড়ির ছাদের ওপর ঘুরতে লাগলাম। টুপির ধার ওপরে বেঁকিয়ে হাওয়ার ধাক্কা কমিয়ে কোন কোন বাড়ির ছাদে নামতে লাগলাম।

আমি বললাম, ইঞ্জিনে তো শব্দ হয়। লোকজন উঠে পড়লো না ?

—কেন ? রাত্রে তো কলকাতার আকাশ দিয়ে অনেক প্লেন উড়ে যায়, লোকজন উঠে পড়ে বুঝি ? নাঃ, তোদের নিয়ে আর পারা গেল না।

পুষন বললো, এই রকম ওড়া-কল পেলে চোরদের খুব মজা হবে।

—এই এতক্ষণে ঠিক ধরেছিস ! নন্তেদা যেন মনের মতো একটা কথা পেলো : ঐ জন্যেই তো আমার ঐ ওড়া-কল কোন কাজে লাগাতে পারচিনে। যা চোর ছ্যাঁচোড়ের দেশ এটা। তাইতো আমার ঐ টুপি আর ব্লোয়ার-সেট গভর্ণমেন্টের পেটেণ্ট-রাইটের অফিসে একটা সেল-এ ভরে সীল করে রেখেচি। নইলে বুঝলি, আজ বাসে-ট্রামে লোককে এত কষ্ট করতে হতো নাকি ? আমার ঐ ওড়া-কল ফিট করে নিয়ে আকাশ দিয়ে যাতায়াত করতে পারতো ! আর দাম মাত্তর পড়তো হাজার খানেক টাকা। তাছাড়া দেশে ঐ টুপি-শিল্প, ইঞ্জিন বা ব্লোয়ার তৈরীর কারখানা কত গজাতো একবার ভেবে দেখ্ !—নাঃ দেশটায় কিসসু হবে না।

হতাশ হয়ে আরো বললো নন্তেদা : দেশটা থেকে কবে চোর জোচ্চোর বিদেয় হবে, কবে সব ধম্মোপুত্তুর যুধিষ্ঠির হবে—তখন যদি আমার এই ওড়া-কল চালু করতে পারি। তবে আমি আশা ছাড়িনি এখনও। ইন্দিরা গান্ধীকে সেদিনও একটা পত্রাঘাত করেচি। দেশের সব ব্যাপারটা জানিয়ে

লিখেচি, যাতায়াতী সমস্যার সমাধানের জন্যে এর চাইতে কমদামী সোজা সরল ব্যবস্থা আর নেই। যদি দরকার হয়, আমি দিল্লীতে গিয়ে ডেমনস্ট্রেসনও দেখিয়ে আসতে পারি। অবশ্য, সেদিন উত্তর এসেচে। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী খুব ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেচেন, ইয়োর লেটার ইজ রিসিভিং অ্যাটেনসন। আপনার চিঠির বিষয়ে বিবেচনা করা হচ্চে! তবে সরকারী ব্যাপার তো! আঠারো মাসে বছর।

প্রচেত বোধহয় নন্তেদার জন্যে সত্যিই দুঃখিত হলো। বললো, না নন্তেদা, তোমার ব্রেনের দাম পেতে হলে ঐ ম্যাডাগাস্কার যাওয়াই ভাল।

পুষন বললো, তা কেন? যদি যেতেই হয়, তবে মেক্সিকোতে যাওয়াই ভাল। তারা লুফে নেবে।

পুষ্কর বললো, আমারও সেই মত্।

নন্তেদা গম্ভীর হয়ে বললো, হ্যাঁ ঠিকই। হঠাৎ ম্যাডাগাস্কার নামটা মনে আসতে ঝোঁকের মাথায় ঐ নামটাই বলে ফেলেছিলাম। আসলে মেক্সিকোতেই যাওয়া ভাল।

আমি আর কিছু বললাম না। তখন প্রাণপণ চেষ্টায় হাসির দমকা হাওয়া চাপবার চেষ্টা করচি।

ওয়াকিং স্টিক

আমাদের নন্তেদার পাত্তা প্রায়ই পাওয়া যায় না।

কোথায় যে ডুব মারে কে জানে।

তবে যখন ভেসে ওঠে, মানে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তখন এক-একখানা যা ছাড়ে নন্তেদা—শুনে আমাদের চোখ ছানাবড়া যায়।

সেজন্যে নন্তেদাকে দেখলেই আমরা ছেলের দল আর সহজে তাকে ছাড়িনে। ধরে-বসি ঃ নন্তেদা, তোমার স্টক ছাড়ো।

নন্তেদা হেসে বলে, স্টক ? স্টক কোথায় রে ? ওসব কথা বলিসনে আর।

—কেন ? কেন ? আমরা অবাক হয়ে যাই।

—কেন আবার ! নন্তেদা চোখ বড়বড় করে বলে, কাগজে পড়িসনে, আজকাল কিছু স্টক করে রাখা বেআইনী। হোর্ডার বলে পুলিশ ধরে নিয়ে যেতে পারে।

শুনে আমরা হো-হো করে হেসে উঠি।

বলি, আচ্ছা বাবা আচ্ছা, তোমার স্টক থেকে নয়, মন থেকেই কিছু বলো।

—তার মানে ? নন্তেদা বললো, মন থেকে বলবো মানে ? বানিয়ে বলবো বলচিস ? আমি কি বানিয়ে গল্প বলি বলতে চাস ! তার মানে বাজে বাতেলা মারি তোদের কাছে ? ঠিক আছে, আর তোদের কোনদিন কিছু বলবো না। এই মুখে চাবি।

নন্তেদা মুখে আঙুল ঠেকালো। সর্বনাশ।

—না, না, নন্তেদা, আমরা সে কথা বলিনি। তাড়াতাড়ি আমাদের দোষ স্বীকার করি ঃ তোমার তো কত বাস্তব অভিজ্ঞতা, তাই থেকেই একটা বলো। আজকাল যা সব গল্প-টল্প বইতে পড়ি, সবই কেন যেন জলো লাগে।

—লাগবেই তো ! নন্তেদা বললো, জানিস, তরকারিতে নুন না দিলে যেমন স্বাদ হয় না, মেয়েদের রূপেও যেমন লাবণ্য থাকা চাই—মানে লবণ, তেমনি গল্পেও নুন না থাকলে বিস্বাদ তো লাগবেই।

ঘাড় নাড়লাম, তা তো বটেই।

নন্তেদা বললো, আর জানিস তো, আমার নাম নন্তে—আমি নোন্‌তা বলে। কাজেই আমি যা কিছু বলি তা সুস্বাদুই হয়। তবে রূপে আমার লাবণ্য বা লবণ আছে কিনা বলতে পারিনে, সে তোরাই বলবি—

—খুব আছে, খুব আছে। তাড়াতাড়ি বললাম।

—না, না, খুব থাকাটা ভালো নয়। লবণ বেশি হলে মুখটা পুড়ে যায়।

—না, না, ঠিক মাপমতোই আছে।

ইস ! নন্তেদা-র পেট থেকে একটা গল্প বার করতে নাজেহাল হয়ে যাচ্চি যেন।

—তবে চল্‌ আমাদের বাড়িতে। নন্তেদা বললো।

বেশ ! নন্তেদা আমাদের তার বাড়িতে নিয়ে গেল।

নন্তেদা বলতে লাগলো, এবার গেছলাম এক ফরেণ্ট অফিসের চাকরি নিয়ে। কাজ হচ্চে গাছ কাটানো। কোন গাছটা কাটতে হবে, সে গাছটা কত লম্বা সব দেখে শুনে কাটবার ব্যবস্থা করতে হবে। যে-সে গাছ যেমন তেমন করে কাটলেই তো চলে না !

কিন্তু আমাকে এমন এক বনে পোষ্টিং করলো যে তার চারধারে পাহাড় ! আর মজা হচ্চে, পাহাড়ের গায়ে কোন বড় গাছ নেই, মানে জঙ্গল শুধু। তবে পাহাড়ের মাথায় সার-সার লম্বা লম্বা পাইন গাছ দাঁড়িয়ে আছে। যেন আমাকে দেখে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে তারা—মিলিটারি অ্যাটেনসনে।

তাদের নাকি কেটে নামাতে হবে। দেখে মায়া হলো। আর কত কথাই যে মনে হলো। মানে উপমা। মনে হচ্ছিলো, পাহাড়ী মেয়েটা যেন তার খোঁপায় সারি-সারি ফুল গুঁজে রেখেচে। সেগুলি বর্বরের মতো টেনে তুলে ফেলতে হবে।

এখন কাজ করতে গেচি। কাজেই ওসব কাব্য করা তো চলবে না। ডিউটি ইজ ডিউটি।

তাই একদিন লোকজন আর কুড়ুল করাত নিয়ে বেরুলাম পাহাড়ের মাথায় উঠে পাইন গাছ কাটতে।

পাইন গাছ দেখেচিস নিশ্চয়ই। লম্বা লম্বা গাছ হয় আর ডালপালা বেশি ছড়ানো থাকে না আমাদের আম গাছ কাঁঠাল গাছের মতো। মানে, বিলিতী গাছ কিনা। কাজেই যখন দাঁড়ায় স্ট্রেট হয়েই দাঁড়ায়। আমাদের দিশী গাছের মত হাত পা ছড়িয়ে এলিয়ে-মেলিয়ে দাঁড়ায় না।

হ্যাঁ যা বলছিলাম! পাহাড়ে উঠে একটা পাইন গাছকে বেছে নিয়ে বললাম, নে, কুড়ুল চালা।

কুড়ুল চললো।

গাছটা কেটে পড়ে গেলে, পরে করাত দিয়ে কেটে টুকরো করে ট্রাকে তুলে করাত কলে পাঠানো হবে।

একটু পরেই মড়মড় শব্দ করতে করতে গাছটা পড়লো ভেঙে। আর ভেঙেই পাহাড়ের গায়ে গড়াতে গড়াতে মাটির দিকে নামতে লাগলো।

পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট জংলী গাছগুলো গাছটার চাপে পিষে যেতে লাগলো। আর গাছটা তেমনিই গড়াতে গড়াতে নামতে লাগলো ক্রমাগত।

কোথাও একটু ঠেক খাচ্চে আবার গড়াচ্চে।

গড়াচ্চে তো গড়াচ্চেই। দিনের পর দিন।

গড়ানো আর শেষ হয় না।

শেষে বিরক্ত ধরে গেল। লোকদের ছুটি দিয়ে দিলাম। বললাম, যা তোরা বাড়ি যা। কতদিন আর বসে থাকবি।

আমিও বাড়ি চলে এলাম। মানে, ফরেষ্ট অফিসের বাংলোতে নয়। সোজা এখানে। কেন, এই দিন-পনেরো আগে আমাকে কদিনের জন্যে দেখিসনি এখানে?

বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখেচি বটে!

—ঐ সেসময় বিরক্ত হয়ে চলে এসেছিলাম। পড়ুক ততদিন গাছটা। দেখি কত গড়াতে পারে। মাই গড্, এখান থেকে ফিরে গিয়ে দেখি গাছটা তখনও পাহাড় থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নামচে—তবে প্রায়ই মাটির কাছে নেমে এসেচে। তবে দেখে বড় মায়া হলো···

—কেন নন্তেদা?

—মায়া হয় না বল্? দেখি যে, গড়িয়ে-গড়িয়ে বেচারা গাছটাকে আর চেনা যায় না। গায়ের ছাল-চামড়া সব ছড়ে গেচে। এমন কি ধড়টাও ঘসে গিয়ে-গিয়ে একেবারে হাড্ডিসার! ইস্, আর কদিন পরে গেলে গাছটার চিহ্ন মাত্র থাকতো না।

এমন সময় হঠাৎ খুক করে একটা আওয়াজ হলো। দেখি আমার পাশে গদাই হাসি চাপবার চেষ্টা করচে। এই রে! সব মাটি করলো বুঝি গদাই। আমি তাড়াতাড়ি একটা জোরে চিমটি কাটলাম তাকে। সে কঁকিয়ে উঠলো—উঃ বাপস্।

—কী হলো? নন্তেদা জিগ্যেস করলো।

গদাইয়ের উপস্থিত-বুদ্ধি খুব। বললো, একটা পিঁমড়ে হঠাৎ কামড়ালো নন্তেদা।

ও আবার পিঁপড়েকে পিঁমড়ে বলে।

যাক, খুব সামলানো গেল। বললাম, তুমি বলে যাও নন্তেদা। দারুন ইন্টারেস্টিং!

নন্তেদা বলতে লাগলো, হ্যাঁ, ভাগ্যিস ঠিক সময়মতো গিয়ে পড়া গেছলো। গিয়ে দেখি বেচারা কাটা-গাছটা সরু লাঠির মতো হয়ে গেচে। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে তুলে নিলাম হাতে। দিব্যি একটা চকচকে ওয়াকিং-ষ্টিক হয়ে গেচে গাছটা। হাতে নিয়ে বেড়াতে বেরোনো যাবে।

—বারে! ছানা বলে উঠলো: আজকাল মেয়েরা রোগা হবার জন্যে কত কী করে। তাদের তাহলে ওপর থেকে ঐ ভাবে ছেড়ে দিলে তো হয়।

—চুপ কর্। তাড়া দিলাম তাকে।

—বোস তোরা। নন্তেদা বললো। তারপর পাশের ঘর থেকে একটা চমৎকার ছড়ি নিয়ে এসে দেখলো: এই দ্যাখ সেই লাঠি! ওয়াকিং স্টিক।

দেখলাম। তবে এবার সবাই নিজেদের গায়ে জোরে জোরে চিমটি কাটতে লাগলাম, পাছে হেসে ফেলি।

দেখা গেল লাঠিটার মাথায় রুপো বাঁধানো।

ছানা বলে ফেললো, লাঠির মাথায় রুপো বাঁধানো হলো কী করে?

—বোধহয় পাহাড়ের গায়ে রুপোর পাত পড়ে ছিলো, তাই জড়িয়ে গেচে।

বলেই গদাই দে লম্বা ওখান থেকে।

নন্তেদা শুধু বললো, এইজন্যে তোদের গল্প বলতে ইচ্ছে করে না। কেবল ফাজলামি। জানিস, রবিঠাকুর তার 'সেক্সপীয়ার' নাটকে বলেচেন, এ সংসারে কত কী ঘটে, তা কেউ জানতেও পারে না।

কাশ্মীরী শাল

একদিন নন্তেদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এক বিয়ে-বাড়িতে।

আমার পিসিমার মেয়ের বিয়ে।

আমি বিয়েবাড়িতে টুকটাক কাজকর্ম করছিলাম।

সন্ধ্যের পর বর এলো। সঙ্গে বরযাত্রী। আর সেই বরষাত্রীর দলে দেখি নন্তেদাও।

দেখেই চেঁচিয়ে উঠলাম, আরে, নন্তেদা যে! তুমি?

—হ্যাঁ আমি। নন্তেদা হেসে বললো, আমি বরের বন্ধু। কিন্তু তুই?

—আমি কনের ভাই। আমার পিসিমার মেয়েরই তো বিয়ে।

—বেশ, বেশ। আমার পিঠ চাপড়ে দিলো নন্তেদা।

শীতকাল। তাই নন্তেদা বেশ একটা ভাল শাল গায়ে জড়িয়ে এসেচে। আর সব বরযাত্রীরাও।

বর ভেতরে গেল। আমি বরযাত্রীদের খাতির করে বসালাম। তাঁদের থাম্পস-আপ, পান সিগ্রেট এগিয়ে দিলাম। তারই মধ্যে নন্তেদাকে বোধহয় একটু বেশি খাতির করেছিলাম। তাই তাদের মধ্যে এক ভদ্রলোক নন্তেদাকে জিগ্যেস করলেন, হ্যাঁরে, এ ছেলেটি তোর জানা দেখচি। কে?

—আমার শিষ্য। আমার লেফটন্যাণ্টও বলতে পারিস।

তারপর নন্তেদা তার বন্ধুদের নাম জানিয়ে একে একে পরিচয় করালো: ইনি হচ্চেন সন্তোষ রায়, ইনি নীহার পাকড়াশী. ইনি অনিল চক্কোত্তি, ইনি প্রফুল্ল দাশগুপ্ত, ইনি অনিল ভৌমিক, ইনি কেশব মুখুজ্জে। এঁরা সব খানদানী আদমী, বুঝলি? বিশেষ করে আজকের দিনে।

আমি নাম শুনতে লাগলাম আর ঘাড় নিচু করে হাতজোড় করে নমস্কার জানাতে লাগলাম। ঘাড়-হাত প্রায় ব্যথা হয়ে গেল।

শেষে একটু হেঁ-হেঁ করে হেসে বললাম, আমি একটু আসচি।

নন্তেদা বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখে আয়। গুড-ব্যাডটা যাতে ভাল হয়, নজর রাখিস। বুঝচিস তো, একে বরযাত্রী আমরা, তার ওপর আমি তোর গুরু—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বলে চলে গেলাম ভেতরে।

খানিক পরে এসে দেখি, নন্তেদাকে ঘিরে ঐ চার-পাঁচজন ভদ্রলোক বেশ জটলা শুরু করে দিয়েচেন। কাছে গিয়ে বিষয়বস্তুটা শুনে আমি তো তাজ্জব। এখানেও সেই চোখ-ছানাবড়া-করার গল্প। আমি ওঁদের গল্প শুনতে জমে গেলাম।

বুঝলাম, ঐ ক'জনের গায়ের শালই ওঁদের কাল হয়েচে। সন্তোষ রায় এক গাল হেসে অনিল ভৌমিকের শালটার গায়ে হাত বুলিয়ে যেই বলেচেন— বাঃ, খুব যে শালীয়েচো দেখচি।

সঙ্গেসঙ্গে অনিল ভৌমিকের উত্তর: আজ্ঞে হ্যাঁ। নিজের পয়সায় কেনা কিনা! শালীর বাপের দেওয়া শাল নয়তো। সাক্ষী ঐ নন্তে।

নন্তেদা হেসে বললো, ঠিক বলেচিস!

নীহার পাকড়াশী একটু ঘুরিয়ে বললেন, কোত্থেকে কেনা হলো?

অনিল ভৌমিক বললেন, একেবারে শালার নয়, শালের বাপের বাড়ি থেকে। মানে কলেজ স্ট্রীটের কোন শাল-হাউস থেকে নয়, একেবারে কাশ্মীর থেকে।

অনিল চক্কোত্তি শালটায় হাত বুলিয়ে বললেন, তবে খেলো মাল! কত দাম নিলো?

শুনে চটে গেলেন অনিল ভৌমিক, হবেই তো খেলো। ডাল লেকে শিকারায় চড়ে যখন যাচ্ছিলাম হঠাৎ দেখি শালখানা জলে ভাসচে। তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে নিংড়ে শুকিয়ে বাক্সের তলায় লুকিয়ে এনেচি। পড়ে-পাওয়া কিনা!

কেশব মুখুজ্জে বললেন হেসে: এর সাক্ষী কি এই শ্রীযুক্ত নন্তে মহারাজ!

নন্তেদা বললো, আমাকে অযথা সাক্ষীও মানচিস কেন তোরা? ভৌমিক কি আমাকে কাশ্মীরে নিয়ে গেছলো?

সন্তোষ রায় বললেন, শালের কথা উঠলোই যখন, তবে শোন্। শাল ছিল আমার বাবার। রেওয়ার রাজার দেওয়া শাল। সে শাল কোনদিন গায়ে দেবার দরকার হতো না। বিছানায় ভাঁজ করে পায়ের কাছে রাখলেই বিছানা গরম হয়ে যেতো। শেষপর্যন্ত পা দিয়ে ঠেলে শালখানাকে বিছানা

থেকে মাটিতে ফেলে দিতে হতো। আমরা সিমলা মসৌরী গেলে লেপ কম্বল কিছুই নিতাম না। শুধু নিতাম ঐ শালখানা।

সন্তোষ রায়ের কথা শুনে আমার অন্তত মনে হতে লাগলো, অনিল ভৌমিকের গায়ের শালখানা যেন স্রেফ ন্যাতা!

অনিল ভৌমিক সন্তোষ রায়কে বললেন, শালখানা একবার দেখাস তো?

—সে শাল আর আছে নাকি? সন্তোষ রায় হাসলো ঃ থাকলে কি আর লেপ কাঁথা কিনে মরি? ঐ শালের ভাঁজ না খোলার জন্যে পোকায় কেটে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিলো।

নন্তেদা হেসে বললো, তাহলে বল, ঐ ঝাঁঝরা শালের পেছন থেকে হাওয়া দিলে ওটা রুম-হিটার হতে পারতো।

প্রফুল্ল দাশগুপ্ত এবার বলে উঠলেন, রুম-হিটারের কথা যখন উঠলোই তখন বলি। কথাটা মিথ্যে নয়। আমার ঠাকুরদার সত্যিই ঐ রকমই একটা শাল ছিল বটে। তাঁর শ্বশুরমশায় তাঁকে দিয়েছিলেন প্রথম জামাই ষষ্ঠিতে। তিনি আবার শালখানা পেয়েছিলেন নেপালের মহারাজার কাছ থেকে। তিনি নেপালের রাজপরিবারের প্রাইভেট টিউটর ছিলেন কিনা!

অনিল চক্কোত্তি অধৈর্য হয়ে বললো, তা শালখানার বিশেষ গুণ বর্ণনা করা হোক।

প্রফুল্ল দাশগুপ্ত উদাস হয়ে বললো, গুণ? সে গুণ বর্ণিব কেমন করিয়া? শালখানাকে ঘরে আলনায় টাঙিয়ে রাখলেই ব্যাস কাম ফতে। ঘর গরম হয়ে যেতো। সত্যিই একেবারে রুম-হিটার।

—তা, সেটা কি চোখে দেখার সৌভাগ্য হবে? কেশব মুখুজ্জে তাঁর পানে রাঙানো ঠোঁট নেড়ে জিগ্যেস করলেন।

—না, প্রফুল্ল দাশগুপ্ত অম্লান বদনে বললেন, সে শাল একবার চুরি হতে হতে বাঁচানো গেছলো। কিন্তু শেষপর্যন্ত আর পারা গেল না। প্রথম-বার শীতকালে একটা চোর ঘরে ঢুকে আলনা থেকে শালখানা নিয়ে ঘর থেকে বেরোবামাত্র ঠাকুরদার ঘরটা ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেল। সেই হঠাৎ-ঠাণ্ডায় ঠাকুরদা কাঁপতে কাঁপতে উঠে ঘর থেকে বেরোতেই একটা গরম হাওয়ার ঝলক তাঁর গায়ে এসে লাগলো। ব্যাস, ঠাকুরদা বাঁই বাঁই করে ছুটলেন সেই গরম হাওয়া লক্ষ্য করে, আর হাতে-নাতে ধরে ফেললেন চোরকে। কিন্তু পরের

বারে আর শালখানাকে রক্ষে করা গেল না। ঠাকুরমা নিজে হাতেই তুলে দিলেন চোরকে।

—বুঝলাম না ঠিক। নন্তেদা হেসে জিগ্যেস করলো।

—বুঝলিনে? প্রফুল্ল দাশগুপ্ত বললেন, ঠাকুরমা নিজের হাতে শালখানা তুলে দিলেন শালার ধোপা চোরকে। শালখানা ময়লা হয়েচে দেখে ধোপা আসতেই ঠাকুরমা সেটা ধোপাকে দিলেন কাচতে। ঠাকুরদা পরে শুনতে পেয়ে একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। কিন্তু ধোপা ততক্ষণে একেবারে হাওয়া—দেশছাড়া। এখন হয়তো অন্য কোথাও সে তার ব্যবসা খুলেচে। আর বর্ষাকালে তার কাপড় শুকোবার জন্যে একদমই কোন মাথা ব্যথা নেই।

সব শুনে নন্তেদা হেসে বললে, যাক, ভাগ্যিস চুরি গেছলো। তাই শালখানা দেখাবার দায় থেকে বেঁচে গেলি!

—কেন, আমি কি মিথ্যেকথা বললাম? তেড়ে উঠলো প্রফুল্ল দাশগুপ্ত।

—থাক থাক চেঁচাসনে। নন্তেদা বললো, ভুলে যাসনে আমরা এখানে বরযাত্রী এসেচি। বেশি বাড়াবাড়ি করলে লুচি মাংস খাওয়া বেরিয়ে যাবে। পাত্রীর শালা এখানে দাঁড়িয়ে। এখুনি গলা ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করবে। কোন শালিশই শুনবে না। কী বল্?

আমি তাড়াতাড়ি জিব কেটে বললাম, ছি ছি, কী যে বলো নন্তেদা।

সত্যিই লজ্জা পেলাম।

তারপর গলা নামিয়ে নন্তেদা সবাইকে বললো, দ্যাখ বাপুরা, যে যা বলচে শুনে যা আর চেপে যা। তবে আমিও বলি একখানা শালের কথা। অবশ্য সে শাল তোদের মতো বাপ ঠাকুরদার ছিল না, আমার নিজেরই ছিল।

বলেই নন্তেদা আমার দিকে চেয়ে একবার চোখ টিপলো।

নন্তেদা অনিল ভৌমিকের শালখানা দেখিয়ে বললো, কাশ্মীরের ওসব কী আর শাল! স্রেফ খদ্দের ধরার জাল! গরম শাল বলতে ছিল আমার সেই শালখানা। শালবনে ঝুলিয়ে রাখলে বোধহয় বনেই আগুন ধরে যেতো, হ্যাঁ। শালখানা আমায় দিয়েছিলো তিব্বতের লামা। সেখানে গেছলাম রেলের কাজে। ক্যালকাটা টু লাসা মনোরেল হতে পারে কিনা তাই সার্ভে করতে। গিয়ে তিব্বতের প্রাকৃতিক শোভা দেখে সার্ভে রিপোর্ট লিখতে গিয়ে লিখতে লাগলাম খাতার পর খাতা কবিতা! জানিস তো,

বাঙালির ছেলে গোঁফ গজাবার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা লেখে! আর আমার তো ঐ বাতিক ছিলই। খবরটা কী করে যেন চলে গেল লামার কানেঃ আমি নাকি আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে পেন্সিল কামড়াই আর কবিতা লিখি। লামার কাছে হাজির হবার তলব এলে, আমি তো থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। কিন্তু হাজির হতেই লামা আমাকে বসতে বলে হেসে বললেন, তুমি নাকি কবিতা লেখো? শোনাও। সাহস পেয়ে আমি তো কড়া গোছের কতকগুলো দুর্বোধ্য কবিতা হাত নেড়ে শুনিয়ে দিলাম। সেসব কবিতার মানে দোভাষী কীভাবে বুঝিয়ে দিলো লামাকে জানিনে, পরদিন দেখি একটা অ্যাসবেসটসের চ্যাপ্টা বাক্স এসে হাজির আমার বাসায়। শুনলাম লামা আমার কবিতা শুনে খুব খুশি হয়ে ঐ দামী গরম শালখানা দিয়েচেন, আর গায়ে দিতে বারণ করেচেন। বলেচেন, গায়ে ফোস্কা পড়তে পারে।

সন্তোষ রায় হাত ঘুরিয়ে বললেন, যা বাব্বা, এমনি শাল!

—শোনই তো আগে! নন্তেদা থামিয়ে দিয়ে বললো, অমন শাল নিয়ে কি হবে আমিও তো ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে আমার ভুল ভেঙেছিলো। গত সালের আগের সালে যখন উত্তরবঙ্গে বন্যা হলো তখন চারধারে জল থৈথৈ করচে। লোকজনের দাঁড়াবার জায়গা নেই, রান্নার ব্যবস্থা নেই। খিদেয় সকলের পেট চোঁ চোঁ করচে। অথচ আগুন কোথায় যে রান্না হবে! সেই সময় খেয়াল হলো আমার সেই তিব্বতী শালের কথা। আমি একটি উঁচু ঢিপিতে গিয়ে সেই অ্যাসবেসটসের মাঝখানটা ভেঙে সেই তিব্বতী শালের ওপরে বড় বড় হাণ্ডা চাপিয়ে পাড়াসুদ্ধু লোকের খিঁচুড়ি রান্না করে দিলাম। তাছাড়া ঐ শালের ওপর তাওয়া চাপিয়ে সকালে এক গাদা টোস্ট, আর রাত্রে গাদা গাদা রুটি দিলাম তৈরী করে।

সবাই এবার হৈহৈ করে উঠলোঃ এ শাল নিশ্চয়ই আছে নন্তে। এ কিন্তু দেখাতেই হবে তোকে।

—দেখাতাম, নন্তেদা গম্ভীর গলায় বললো, কিন্তু গত সালে পশ্চিমবঙ্গের বন্যায় শালখানা ভেসে গেল যে।

—আসুন। আপনারা সবাই অনুগ্রহ করে আসুন, জায়গা হয়েচে। পিসেমশায়ের ভাই হাত জোড় করে সকলকে খেতে যেতে বললেন।

এমন সময় দেখি আর এক ভদ্রলোক, তাড়াতাড়ি প্রায় ছুটতে ছুটতে ঢুকলেন সেখানে। পরে বুঝলাম, উনিও বরযাত্রী।

—এই যে সুনীলময় যে। সবাই চেঁচিয়ে উঠলেন।

—ঘোষ মশায়ের এত দেরী কেন? নন্তেদার প্রশ্ন।

সুনীলময় ঘোষ বললেন, হ্যাঁ ভাই, দেরী হয়ে গেল। জানিস তো বদলি হয়ে গেছি অনেক দূরে। সেই মেদিনীপুরের গোদাপিয়াশালে।

নন্তেদা সেই রকম গম্ভীর গলাতেই বললো, অবশ্য তাতে ক্ষতি হয়নি কিছুই। বরং জাষ্ট ইন টাইম। আগে এলে স্রেফ গাঁজায় দম দিতে হতো।

আমি হেসে বললাম, আপনারা উঠুন, চলুন। বিয়ে তো হবে রাত বারোটার পর! কাজেই খেয়ে নেওয়াই ভাল।

তারপর আমি নন্তেদার কানেকানে বললাম, উঃ! যা একখানা শোনালে! বুঝলাম, তোমার কাছে কেউই পাত্তা পায় না। তুমি একটা টপ-আর্টিষ্ট!

নন্তেদা আমার পিঠ চাপড়ে বললো, থ্যাংক ইউ লেফটন্যাণ্ট!

রুস্কি ভাল্লুস্কি

অনেক দিন বাদে নন্তেদার সঙ্গে আবার দেখা হলো। আমাদের সেই নন্তেদা। মাই ডিয়ার নন্তেদা।

এতদিন কোথায় ছিল, তা জানিনে। তবে অফিসের কাজে এখানে-ওখানে তাকে ঘুরতে হচ্চে এ খবরটা পেয়েছিলাম। আর উড়ো-খবর পেয়েছিলাম, নন্তেদা নাকি বিদেশ গেচে।

আমি হাবুল বাবলি আর নানু—আমরা সবাই নন্তেদার ভক্ত। তাকে দেখলেই আমরা ধরে বসি, নন্তেদা গল্প বলো।

সঙ্গেসঙ্গে গল্প শুরু করে দেয় নন্তেদা। এক মিনিটও দেরি হয় না। গল্প যেন তার জিবের ডগায় পাকা আমের মতোই ঝুলতে থাকে। একটা ঢিল ছুঁড়লেই হলো।

কিংবা যেন তুবড়ি। একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে একটু ধরিয়ে দিলেই, ব্যাস!

আর কি সব মজার মজার গপ্পে!

সেই নন্তেদাকে এবার যখন দেখলাম, তখন কেমন যেন ঘাবড়ে গেলাম আমরা।

এক্কেবারে পাক্কা সাহেব!

আমরা ক'জন দূর থেকেই দেখেছিলাম নন্তেদাকে। হাতে ব্যাগ নিয়ে হনহন করে চলেচে।

যখন চাকরি ছিল না, নন্তেদা তখন পায়জামা পাঞ্জাবী পরতো! যখন প্রথম চাকরি হলো তখন পরতো টেরিকটের সার্ট আর প্যান্ট। কিন্তু এবার দেখি, একেবারে কোট-প্যান্ট নেকটাই পরা, পায়ে চকচকে জুতো মোজা। হ্যাঁ, পাক্কা সাহেব!

তবে আরো আশ্চর্য হয়ে গেলাম, যখন দেখলাম কোট প্যাণ্ট নেকটাই পরা পাক্কা সাহেব নন্তেদার মুখে বিড়ি! হ্যাঁ, বিড়িই তো!

ছ্যাঃ, বিড়ি! চারমিনার সিগ্রেট হলেও না হয় বুঝতাম। শুনেচি ঐ সিগ্রেট নাকি সস্তাও।

তা, নন্তেদা তো ঐ সিগ্রেটও খেতে পারতো। তাতে কী এমন খরচা হতো? অথচ যখন চাকরি ছিল না তখনও নন্তেদাকে সিগ্রেট টানতে দেখেচি। ক্যাপস্টান না কি যেন নাম।

আর এখন নিশ্চয়ই নন্তেদার চাকরির উন্নতি হয়েচে, মাইনেও বেড়েচে, অথচ মুখে কিনা বিড়ি! শালপাতার মোড়া সুতো পাকানো খাকি বিড়ি।

আমরা কেমন যেন নরমে গেলাম, দুঃখ পেলাম, হতাশ হলাম।

গুরুদেব যদি পালংকে না শুয়ে মাটিতে ধুলোয় শুয়ে থাকেন, তা দেখে ভক্তরা যেমন মনে ব্যথা পায়, আমাদের অবস্থাও হলো তেমনি।

অথচ এককালে তো নন্তেদা ট্যাকসিতেও আসা-যাওয়া করেচে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরেচে বড় বড় প্যাকেট নিয়ে। আর এখন···বিড়ি!

ধ্যেত্তেরি।

বাবলি বললো, একবার জিগ্যেস করলে হয়। ব্যাপারটা কি?

হাবুলটা ভীতু সম্প্রদায়ের লোক। বললো, চেপে যা না বাপু।

আমি ভাবলাম, তবে কি নন্তেদার পোষাক-আশাক, ট্যাক্সি চাপা, সিনেমা দেখা, সব বাইরের শো। ভেতরে সব ঢং ঢং! আর তা যদি হয়, তবে চাঁদা করে টাকা উঠিয়ে নন্তেদাকে সিগ্রেট কিনে দেবো। ভাল দামী সিগ্রেট।

হাবুলটা বোকা। বলে, কেন?

দাঁত খিঁচিয়ে বললাম, কেন আব্বার! নন্তেদার বিড়ি খাওয়া মানে আমাদেরই অপমান, আমাদেরই লজ্জা! লোকে বলবে, কী রে, তোদের নন্তেদা কোট প্যাণ্ট পরে বিড়ি ফুঁকচে যে! সেটা শুনতে ভাল লাগবে? তাছাড়া নন্তেদা আমাদের ফুটবল খেলা দেখায়নি? সিনেমা দেখায়নি? চপ কাটলেট খাওয়ায়নি? বল্ তোরা?

বাবলি দেখলাম আমার দলে চলে এলো। বললো, ঠিক বলেচিস।

—কিন্তু কথাটা নন্তেদাকে বলা যায় কী করে? বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? বললাম আমি।

সেইদিনই সন্ধ্যায় গুটিগুটি আমরা চার ভক্ত গেলাম নন্তেদার বাড়িতে।

গিয়ে দেখি নন্তেদা বাহিরের ঘরে ইজিচেয়ারে বসে একখানা খবরের কাগজ পড়চে। পরনে সিল্কের পায়জামা আর ড্রেসিং গাউন। আর—আর মুখে সেই খাকি বিড়ি!

ইচ্ছে হলো মুখ থেকে বিড়িটা টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিই রাস্তায়।

কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি সব কাজ করা যায়? ততক্ষণে আমাদের পায়ের শব্দে নন্তেদা মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা সরিয়ে ফেলেচে। আমাদের দেখে হেসে বললো, আয় আয়, বোস। এতদিন কোথায় ছিলি সব?

—এখানেই। একটু অভিমান করেই বললাম।

—আসিস নি কেন এতদিন?

—তুমি তো—মানে আপনি তো এখন সাহেব—।

শুনেই হো হো করে হেসে উঠে নন্তেদা বললো, আরে বাপস! তোদের কাছেও প্রমোশন পেয়ে গেলাম! একেবারে আপনি? ওরে, আমি তোদের সেই নন্তেদাই আছি। বাইরে যা দেখচিস—এটা খোলস, মুখোসও বলতে পারিস।

—তা কি করে জানবো? নানু হাত ঘুরিয়ে বললো, আমরা তো ভাবলাম তুমি এখন সাহেব হয়ে গেচো, চিনতেই পারবে না আমাদের।

নন্তেদা বললো, অবশ্য আমারই অন্যায় হয়ে গেচে। ক'দিন হলো এসেচি, কিন্তু কলকাতার আফিসের কাজের চাপে তোদের খবর নিতেই পারিনি। তা সব কেমন আচিস বল্?

হাবুল ছোট্ট করে বললো, ভালই।

এবার আমি সাহস করে গলা খাকারি দিয়ে বললাম, নন্তেদা, আমরা একটা কথা জিগ্যেস করতে এসেচি—

—কি কথা? আরে, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বোস।

বসলাম আমরা। গলাটা আমাদের সকলেরই যেন শুকনো শুকনো, মনেমনে যেন দমে গেচি ভয়ে। না, কথাটা না বললেই হতো।

—কি কথা রে? হাসলো নন্তেদা! তাঁর হাসিতে যেন মনে জোর পেলাম। ঠিক করলাম যা থাকে কপালে, বলেই ফেলি। বললাম, তুমি তো

সিগ্রেট খেতে পারো। এখন বিড়ি খাও কেন? বিশ্রী!

সঙ্গে সঙ্গে নানু বললো, চুরুট খেতেও তো পারো। আমার দিদির শ্বশুর তো চুরুট খান।

নন্তেদা এবার হো হো করে হেসে উঠলো। সেই প্রাণ খোলা হাসি ঃ এই কথা? তবে তো অনেক কথাই বলতে হয় রে?

না, নন্তেদা বদলায়নি তাহলে। ধরে বসলাম, বলো না কী ব্যাপার।

—তবে শোন, নন্তেদা শুরু করলো, তোরা জানিসনে বোধ হয়, আমি কি কাজ করি। মেটিরিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে একটা বড় পোস্টে আছি। আবহাওয়া মেপে বেড়ানো আমার কাজ। তাই হাওয়াই জাহাজে হিল্লী-দিল্লী শুধু নয়—নর্থপোল সাউথপোল করেও বেড়াতে হয়।

কয়েক মাস আগে এই কাছাকাছি গেছলাম কাবুলে। কাবুল আর কাশ্মীরের তাপমাত্রা তুলনা করতে, সেখানকার শীত গ্রীষ্মের আবহাওয়া মাপতে। বিশ্ব-আবহাওয়া আফিস থেকে একবার আমার রিপোর্ট দেখে আমেরিকা থেকে রিপোর্টার্সরা প্লেনে এসে আমার কাছে হাজির। তারা আমার এক সাক্ষাৎকার নিয়ে, আমার ছবি দিয়ে এক বিরাট বিবরণী ছাপিয়ে দিলো নিউইয়র্ক টাইমসে। আর একটা কাগজে আমার কার্টুন ছাপা হলো।

—কার্টুন! বললাম আমি।

—হ্যাঁরে, কার্টুন। দেখেচিস, গির্জার চুড়োয় টিনের তৈরী মুরগী লাগানো থাকে, হাওয়া যেদিকে চলে মুরগীটার মুখ সেদিকে ঘুরে যায়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেচি বটে। বাবলি ঘাড় নাড়লো।

নন্তেদা বললো, সেই রকম কার্টুনে ছাপা হলো, আমি যেন গির্জার চুড়োয় উপুড় হয়ে শুয়ে হাওয়ার দিক নির্ণয় করচি।

হাবুল বললো, এ তো তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা?

—আরে না না—নন্তেদা আমাদের বোঝালো, ওসব দেশে এটা রীতিমত সম্মান! ভি-আই-পি হয়েচি বলেই তো আমাকে নিয়ে হৈ হৈ! দেখিসনে, আমাদের দেশেও বড় বড় লোকদের নিয়েই কার্টুন আঁকা হয়। হেজিপেজিদের নিয়ে হয় না।

—তা বটে। নানু কথাটা বুঝলো।

নন্তেদা বললো, আর কি, সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় আমার ডাক পড়লো, সেখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে রাশিয়ার আবহাওয়ার নাকি তুলনা করে রিপোর্ট দিতে হবে। ডেলি হাজার ডলার ফি। এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিংয়ের একশো তলার উপরে সাজানো অফিস। আর অ্যাসিষ্ট্যান্ট পেলাম দশজন আমেরিকান সাহেব আর মেম। হরদম তারা উঠতে-বসতে 'ইয়েস স্যার—ইয়েস স্যার' করতে লাগলো।

নন্তেদা বলতে লাগলো, তা আমার দিনগুলো বেশ ভালই কাটছিলো, কিন্তু একদিন এক অদ্ভুত কান্ড ঘটলো। জু-গার্ডেনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। কী ব্যাপার? না জু-গার্ডেনের রাশিয়ান শ্বেত ভালুকটা তার এয়ার-কণ্ডিসণ্ড ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েচে। তার নখ দিয়ে এক সাহেবের বুক চিরে দিয়েচে, এক সাহেবের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিয়েচে, আর একজন মেমসাহেবের গালের মাংস খাবলে নিয়েচে।

মানে, রাশিয়ান ভালুকের তো খুব ঠান্ডায় সাইবেরিয়ার বরফের মধ্যেই থাকা অভ্যাস কিনা। অবশ্য আমেরিকাতে ওরাও ওকে মোটা কাঁচ আঁটা এয়ার-কণ্ডিসণ্ড ঘরেই রেখেছিলো। যত্ন করেই রেখেছিলো। রাশিয়া নাকি ঐ ভালুকটাকে বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবেই আমেরিকাকে দিয়েছিলো—যেমন ভারত থেকে আমরা দেশ বিদেশে হাতি পাঠাই।

তা আমেরিকা ভালুকটাকে জামাই-আদরেই রেখেছিলো। অথচ এ কী কান্ড! দুজন আমেরিকান ঘায়েল হয়ে গেল, একটি মহিলার উপর আক্রমন হলো, অথচ সশস্ত্র পুলিশরা তাকে গুলি করে মেরে ফেলতেও পারে না, পাছে রাশিয়া রাগ করে, অপমান বোধ করে। একে তো দু'দেশে আদায়-কাঁচকলা সম্পর্ক। তবে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখবার জন্যে ভালুক প্রেজেন্ট করেচে রাশিয়া, আর সেই ভালুককে মেরে ফেলা? হয়তো এজন্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও লেগে যেতে পারে।

আর আমেরিকার ব্যাপার তো! তখনও সাদা ভালুকটা জু-গার্ডেনের মধ্যে একটা বড় রকমের বরফের গোলার মত ছুটে ছুটে বেড়াচ্চে পাগলের মতো—অথচ তারই মধ্যে ঐ ভালুকের ছবিসুদ্ধ খবরের কাগজ বেরিয়ে গেল। হকাররা চীৎকার করতে লাগলো, লুক লুক, ভালুক ভালুক।

হাবুলটা হাবা গোবা। হঠাৎ বলে বসলো, নন্তেদা, ভালুক তো বাংলা কথা।

শুনেই নন্তেদা বললো, ঠিক ধরেচিস! রাইট! মানে! হকার-বয়গুলো চেঁচাচ্ছিলো, হীয়ার হীয়ার, বীয়ার বীয়ার। মানে, দেখো দেখো ভালুক দেখো।

ওদিকে টেলিভিসনেও ভালুকের ছোটাছুটি দেখানো হচ্চে। তাতে বলচে, এ স্নো-বল-গেম—উইদাউট প্লেয়ার্স। মানে, খেলোয়ার ছাড়াই বরফ-বল খেলা চলচে।

হঠাৎ দেখি চার-পাঁচটা পুলিশভ্যান সাইরেনে চিল-চীৎকার করতে করতে আসচে। এসেই ঝপাঝপ ভ্যান থেকে নেমেই জু-গার্ডেনের মধ্যে ঢুকে কাঁদানো-গ্যাস ছাড়তে লাগলো ভালুকটাকে লক্ষ্য করে। চারদিকে ধোঁয়ায় ধোঁয়া। আমার চোখ নাক দিয়ে জল ঝরতে লাগলো। তবু আমি জু-গার্ডেনের মধ্যে ঢুকলাম।

—কেন? কেন? এবার আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম।

—কেন আবার? নন্তেদা বললো, এমনি-এমনি ডেলি হাজার ডলার করে নিচ্চি! দেখতে হবে না কেন ভালুকটা ক্ষেপে গেল। নিশ্চয়ই রাশিয়ার ঐ ঠাণ্ডার শ্বেত-ভালুকের পক্ষে আমেরিকার আবহাওয়া ঠিক জুৎসই নয়। কিংবা হয়তো এয়ার-কণ্ডিশন মেশিনটা বন্ধ হয়ে গেছলো। তাহলে তো আমার রিপোর্টে ঐ এয়ার-কণ্ডিশন কোম্পানীর বারোটা বেজে যাবে।

কিন্তু এগোয় কার সাধ্যি। কাঁদানো-গ্যাসের ধোঁয়ায় চোখের জলে নাকের জলে আমার দামী স্যুটটা ভিজে সপসপ করতে লাগলো। তবু এগোতে লাগলাম। আমাকে এগোতে দেখে পুলিশরা হৈ হৈ করে উঠলো, হ্যালো স্যার, প্লীজ গেট আউট। বীয়ার দেয়ার।

আমি ধমক দিয়ে উঠলাম, ডোণ্ট শাউণ্ট! ইউ গেট আউট। রাগের মাথায় একটা ইংরেজী কবিতাই হয়ে গেল।—আরো বললাম, ষ্টপ ইয়োর কাঁদানো-গ্যাস! রাগের চোটে কাঁদানো-গ্যাসের ইংরেজী কথাটা 'টীয়ার গ্যাস' মনেই এলো না।

হঠাৎ দেখি, ভালুকটা ঘোঁৎঘোঁৎ করে এগিয়ে আসচে আমারই দিকে। দেখেই তাকে জড়িয়ে ধরবার জন্যে আমি আমার দু'হাত বাড়িয়ে দিলাম। ভালুকটা দৌড়ে আমার সামনে এসে তার পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সামনের দুপায়ের নখ বার করে আমাকে চিরতে এলো। কিন্তু আমি তার আগেই ঐ সামনের দু'পা সমেত তাকে জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ

নিয়ে বললাম, হিন্দি-রুশি ভাই ভাই। ইন্দুস্কি-রুস্কি ব্রাতিয়া।

ব্যাস! সঙ্গেসঙ্গে একেবারে জল। অমনি ভালুকটা তার জিভ দিয়ে আমার গাল চাটতে লাগলো।

ওদিকে ততক্ষণে লোকে লোকারণ্য। পুলিশরা আমাদের কাণ্ড দেখে কাঁদানো-গ্যাস ছোঁড়া বন্ধ করে দিয়েচে। হাঁ করে দেখচে মানুষ-ভালুকের আলিঙ্গন। দেখচে অহিংসাই পরম ধর্ম।

আমি ভালুকটার গা মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, ছিঃ, ওরকম করতে নেই। ওতে দেশের বদনাম হয়।

বলেই পুলিশের একজনকে ডেকে বললাম, যাও, শিগগীর একটা ছুরি নিয়ে এসো।

—ছুরি। আঁৎকে উঠলো বাবলি, বিশ্বাসঘাতকতা করা?

—শোনই আগে! নন্তেদা বললো, পুলিশটা তাড়াতাড়ি দৌড়ে সামনের রেষ্টুরেন্ট থেকে একটা রুটি কাটার ছুরি নিয়ে এলো।

দেখে রেগে গেলাম, একি! রুটি কাটা ছুরিতে কি করে হবে? আচ্ছা, দাও, ওটাই দাও—

ছুরিটা নিয়ে আমি জুতো সুদ্ধু আমার বাঁ পা-টা তুলে জুতোর তলায় চামড়ায় সেটা শান দিতে লাগলাম। ভালুকটা বুঝতেও পারলো না। সে তখনও তার সামনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমার গাল চাটচে। আমি ততক্ষণে ছুরিটা ঘসে ঘসে খুব ধারালো করে নিয়েচি।

—তারপর বসিয়ে দিলে তার বুকে? হাবুল যেন চুলবুল করে উঠলো।

—না, নন্তেদা গম্ভীর হয়ে বললো, আমি ধারালো ছুরিটা দিয়ে ভালুকটার মাথার চাঁদির ঘন লোমগুলো কামিয়ে দিলাম।

—এ্যাঁ? কেন? সভয়ে একসঙ্গে বলে উঠলাম সবাই, ভালুকটার মাথায় ঘোল ঢালবে বলে?

—না, মাথাটা তার ঠাণ্ডা করবো বলে—নন্তেদা তেমনি গম্ভীর হয়েই বললো, আমি এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি একটা বাচ্চা ছেলে তার বাবার হাত ধরে আইসক্রীম খাচ্চে, আর মজা দেখচে। আমি খোকাকে কাছে ডাকতেই দেখি সে সাহস করে এগিয়ে এলো। আসতেই তার হাত থেকে আইসক্রীমের কাপটা ছোঁ মেরে নিয়ে ভালুকটার চাঁচাঁ চাঁদির ওপর ঠাণ্ডা আইসক্রীম উপুড় করে বসিয়ে দিলাম। তাতে মাথাটা তার শুধু ঠাণ্ডাই হলো না, ভালুকটার

গরম চাঁদিতে লেগে আইসক্রীম সব গলে গেল। আর তার গাল বেয়ে বেয়ে পড়তে থাকায়—সে আমার গাল ছেড়ে জিব বার করে নিজের গাল চাটতে লাগলো।

নন্তেদা বলতে লাগলো, এসব ব্যাপার ঘটলো বোধহয় পাঁচ মিনিটের মধ্যে। আর ততক্ষণে প্রায় সারা আমেরিকার রিপোর্টাররা আর ফোটো-গ্রাফাররা এসে হাজির। তারা খস খস করে লিখচে, আর ক্লিক ক্লিক করে ফটো তুলচে।

আমার ওসব দেখবার সময় ছিল না। আমি তখন ভালুকটার সামনের দু'পায়ের গোছা চেপে ধরে পালস দেখচি, বুকে মাথা রেখে হার্ট বিটিং শুনচি।

এমন সময় হঠাৎ একটা ফ্লাশ আলো জ্বলে উঠলো। এক অর্বাচীন ফোটোগ্রাফার দিনের বেলাতেই তার ক্যামেরার ফ্লাশ বাল্ব জ্বালিয়েচে। সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ভালুকটা গেল ক্ষেপে। ভাবলো হয়তো তাকে মারতে এসেচে কেউ। সঙ্গেসঙ্গে সে আমাকে ছেড়ে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ঐ ফোটোগ্রাফারের ওপর। নখ দিয়ে তাকে চিরে দু'ফাঁক করে দিলো, তার ক্যামেরা ভেঙে চুরমার করে দিলো। তারপর যাকে কাছে পেলো তারই নাড়িভুঁড়ি বার করতে লাগলো। সবাই তো ভয়ে যে যেদিকে পারলো ছুটলো। এ-ওর ঘাড়ে পড়তে লাগলো। মরলো কয়েকজন হুড়োহুড়িতেও।

বুঝলি. দেখে শুনে আমি তো হতভম্ব। আমার কান্না পেতে লাগলো। এত কষ্ট করে ভালুকটাকে ধাতস্থ করলাম, অথচ ঐ হতভাগাটার জন্যে—

দু'হাত প্যান্টের দুই পকেটে ঢুকিয়ে হত্যাকাণ্ড দেখছিলাম, আর ভাব-ছিলাম, কী করা যায়, হঠাৎ ডান পকেটে আমার হাতের আঙুলে কী যেন ঠেকলো। বার করে দেখি বিড়ি।

—বিড়ি! নানু জিগ্যেস করলো, ওখানে বিড়ি কোথায় পেলে নন্তেদা?

নন্তেদা হেসে বললো, আরে, সেই তো কথা। ভগবান জুটিয়ে দিলেন। মানে, সেইদিনই জাহাজের একজন বাঙালী সেলর-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো, এক রেষ্টুরেণ্টে। সেই দিয়েছিলো খেতে। বিড়ি খেতে পারিনে, তাই পরে খাবো বলে পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। এখন কাজে লেগে গেল।

হঠাৎ কী খেয়াল হলো দেশলাই বার করে বিড়িটা ধরিয়ে ভালুকটাকে ডাকলাম, ভো ভো—রুস্কি—ভাল্লুস্কি !

ডাক শুনেই সে আমার দিকে এগিয়ে এলো। এবার আমি আর দেরি করলাম না। এক মুখ বিড়ির ধোঁয়া নিয়ে রেডি হয়ে রইলাম। আর ভালুকটা যেই গতবারের মতো এগিয়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরতে গেল, ওমনি তার নাকের গর্তে ঐ বিড়ির ধোঁয়া দিলাম ছেড়ে।

সঙ্গেসঙ্গে অজ্ঞান। ধড়াম করে ভালুকটা পড়লো আমার পায়ের কাছে। আমি তক্ষুনি হুকুম দিলাম, আর দেরি নয়, এক্ষুনি ওকে ওর ঘরে পোরো।

পুলিশরা এতক্ষণ পগার পার হয়ে গেছলো। আমার ডাকে সবগুলো এসে ভালুকটাকে চ্যাংদোলা করে তার ঘরে নিয়ে গেল।

নন্তেদা এতক্ষণে থামলো।

আমরাও কেমন যেন চুপ মেরে রইলাম। একটু পরে নন্তেদাই বলতে লাগলো, কিন্তু আমি আর জু-গার্ডেন থেকে বেরুতে পারিনে। আমাকে সবাই ঘিরে ধরেচে ঃ তুমি মুখের থেকে কিসের ধোঁয়া বার করলে বলো—

একজন সাহেব, বোধহয় হিন্দু শাস্ত্র একটু-আধটু পড়েছিলো। বললো, ব্রহ্মা অগ্নি—

আমি বললাম, দিস ইজ বিড়ি !

প্রশ্ন, হোয়াট ? বি—ডি ?

গম্ভীর গলায় বললাম, ইয়েস, বি-ডি—বেঙ্গলস ডোজ ! ভীষণ জিনিস ! অদ্ভুত নেশা হয়।

সঙ্গেসঙ্গে ভিনি-ভিসি-ভিডির মতোই বেঙ্গল-ডোজ বিড়ি আমেরিকা জয় করে নিলো। সেই থেকে কোটি-কোটি টাকার বেঙ্গল-বিড়ি এক্সপোর্ট হচ্চে আজও আমেরিকায়।

আর এখন বুঝলি, কেন বিড়ি খাই ?

মাছ ধরা

আমরা ক'জন ঠিক করলাম, মাছ ধরতে যাবো।

কিন্তু সুবিধেমত পুকুর একটা খুঁজে পাওয়া গেল না। কলকাতার কাছাকাছি তো কোন পুকুরই নেই আর। যা জমির দর! তাই পুকুর-গুলোকে ভরাট করে সেগুলো বিক্রী করে দিচ্চে চড়া দামে, আর দু'দিন বাদেই চড়চড় করে উঠচে বাড়ির চুড়ো।

কাজেই আজ যেখানে জল, কাল সেখানে ভাড়াটে ধরবার জাল। মাছ ধরবার জাল বা ছিপ ফেলবার পুকুর কোথায়?

হঠাৎ খেয়াল হলো, বেলঘোরে-তে নন্তেদার ভগ্নীপতির বাড়িতে বাগান আছে, আর একটা বড় পুকুরও আছে সেখানে। নন্তেদাকে বললেই হবে।

তবে নন্তেদার কাছে যাওয়া মানেই তার 'হাই-হাই টক' শুনতে হবে, আর হজম করতে হবে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত আমার ওপরই ভার পড়লো নন্তেদাকে ধরে তার ভগ্নীপতির পুকুরের ব্যবস্থা করা। ন্যাড়া, ভূতো, স্যাণ্ডা সবাই আমাকে তাদের প্রতিনিধি করে পাঠালো: যা ভাই, তুই বললেই হবে। তোর কথা ফেলতে পারবে না। আর আমরা তো পুকুর চুরি করতে যাবো না, যাবো মাছ ধরতে শুধু!

ন্যাড়া বাধা দিলো। বললো, মাছ ধরতে দেওয়াটা আজকাল কম নাকি? জানিসনে বাজারে মাছের দর? কাটা-পোনা পনেরো ষোলো—

শুনে ভূতো ধাক্কা দিলো, তুই থাম্ তো, এখন এলো বাজার দর শোনাতে!

স্যাণ্ডা বললো, যা বলেচিস! বন্ধুর জন্যে বন্ধু প্রাণ দেয়, আর পুকুরের দুটো মাছ ধরতে দেবে, এ আর এমন কি কথা!—আমাকে ঠেলে দিয়ে বললো, তুই আর এদের তত্ত্বকথা শুনিসনে ডাইরে ডাইরে। সোজা

কাজটা বাগিয়ে ঘুরে আয়। তোর নন্তেদাকে বেশ ঠান্ডা মেজাজে সব বুঝিয়ে বলবি, বুঝলি?

ভূতো বললো, আর এ-ও বলিস, মাছও বিদ্যের মতো, যতোই করিবে দান ততো যাবে বেড়ে!

ন্যাড়া হেসে বললো, হ্যাঁ তাই বলিস। তোর নন্তেদা যদি ঘাস খায় তো তাই বুঝবে!

শুনে ভূতো বললো, দ্যাখ, এ-সংসারে ঠিক বোঝাতে পারলে কাঁচা ঘুঁটিও পেকে যায়। নইলে পাকা ঘুঁটিও যায় কেঁচে! তুই আর ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করিসনে বাপু! শুভযাত্রায় অমন বাধা দিতে নেই।

—যা বলেচিস! বললাম আমি: আমার ঘটেও তো যা হোক একটু আছে, তাই দিয়ে দেখি কী করতে পারি।

এবং আর দেরি না করে 'দুগগা শ্রীহরি সিদ্ধিদাতা গণেশ' নাম স্মরণ করে রওনা হলাম নন্তেদার বাড়ি। পাঁজি না দেখলেও, বোধকরি শুভলগ্নেই শুভযাত্রাটি হয়েছিলো, কারণ গিয়ে শুনি নন্তেদার চাকরিতে প্রমোশন হয়েচে, মাইনে বেড়েচে তার। মেজাজটা দেখলাম বেশ ফুরফুরে। যেতেই আদর-আপ্যায়ন, চা-জলখাবার ইত্যাদি জুটে গেল, এবং শেষে নন্তেদা বললো, ওঃ, তুই যে মনে করে এসেচিস, তাতে যে কী আনন্দ হচ্চে, কী বলবো! যাক, আমার কথা মনে আছে তা হলে!

এতক্ষণ নন্তেদার কথার ফুলঝুরি আর আদর-যত্নের ঘটাঘটিতে আসল কথাটি বলবার সুযোগ পাইনি। এবার হেসে বললাম, নন্তেদা, সত্যি কথা বলতে কি, তোমার নয়, তোমার ভগ্নীপতির পুকুরের কথা মনে পড়তেই এলাম।

—তার মানে? নন্তেদা জিগ্যেস করলো।

মানেটা বুঝিয়ে দিলাম সবিস্তারে, এবং সব শুনে নন্তেদা বললো, তুই, তোর বন্ধুরা মাছ ধরতে আসবি, এ তো আমার ভগ্নীপতির পুকুরের ভাগ্য, আমার তো বটেই! কারণ আমাকে দিয়েই এই শুভকাজটা শেষপর্যন্ত হবে।

খুব খুশি হয়ে জিগ্যেস করলাম, তা নন্তেদা, তুমি ঐ পুকুরের মাছটাছ ধরো না?

—ধরবার দরকার হয় না। নন্তেদা বললো, পুকুরে মাছ গিজগিজ

করচে। যখন বোনের বাড়ি যাই, সকালে উঠে দাঁতন করতে করতে পুকুরে দু'একটা ঢিল ছুঁড়ি—তাতেই দু'তিনটে মাছ জল থেকে লাফিয়ে উঠে আছড়ে পড়ে বোনের রান্নাঘরের বারান্দায়। বোন সেগুলো কেটে-কুটে সঙ্গেসঙ্গে কড়াইয়ে চাপিয়ে ঝাল ঝোল রেঁধে ফেলে।

বুঝলাম, নন্তেদার সেই 'হাই-হাই-টক' শুরু হয়ে গেল। তবে কাজ গোছাতে এসে সব কিছু শোনা আর মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নইলে ঐ যে—পাকা ঘুঁটি কেঁচে যাবারই সম্ভাবনা।

তাই শুধু হেসে বললাম, বাঃ, বেশ তো! একদম টি-গার্ডেন টু টি-পট!

—তা যা বলেচিস। নন্তেদা বললো, তবে হ্যাঁ, তোরা তো সব মাছ-গুলোর কাছে অচেনা, মানে নতুন লোক, কাজেই মাছ ধরবার 'চার' কিন্তু সঙ্গে আনতে ভুলিসনে! মাছকে ভাল ভাল খাবারের 'চার' দিয়ে লোভ না দেখালে—মানে কলকাতার শহরতলির মাছ কিনা—ভারি চালাক!

আমি বললাম, তা তুমি ঢিল ছুঁড়লে মাছগুলো বোকার মতো উঠে আসে কেন?

—ঐ তো মজা! নন্তেদা বললো, প্রাণের ভয়ে উঠে আসে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের কপালে যা ঘটে সে খবরটা তো আর তারা ফিরে গিয়ে জানাতে পারে না আর সবাইকে। আর পুকুরের তলায় কোন খবরের কাগজও নেই।

বললাম, তা বটে।

নন্তেদা বললো, শোন তবে, কেন 'চার' আনতে বললাম। একবার এক পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে আমি প্রায় বেইজ্জত হয়ে গেছলাম আর কি।

—কি রকম? জিগ্যেস করলাম উৎসুক হয়েই।

নন্তেদা বললো, সে এক মজার ব্যাপার। তখন আমার ঐ বোনের বিয়ে হয়নি, কাজেই বেলঘোরের ঐ পুকুরে নয়, অন্য এক পুকুরে মাছ ধরতে গেচি, কিন্তু তাড়াতাড়িতে মাছের 'চার' নিয়ে যেতেই গেচি ভুলে। প্রায় মাইল তিনেক হেঁটে সেই পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে দেখি—মা থলেতে 'চার' ভরে দিতে ভুলে গেচে, শুধু আমার খাওয়ার জন্যে চিঁড়ে, গুড়, কলা ভরে দিয়েচে, আর একটি শিশিতে করে দুধ। বোঝ্ তখন ব্যাপারটা।

—ইস্। সত্যিই তো। বললাম আমি।

—অথচ দু'দিন ধরে 'চার' তৈরী করেচি কত কষ্ট করে, আর সেই 'চার'—

নন্তেদা হাত নেড়ে বললো, আমার মেজাজই গেল খারাপ হয়ে। ধেত্তেরি! চিংড়ে-গুড় তো ছুঁড়ে ফেলে দিলাম জলে। ক'টা কলা আর দুধটাও ফেলতে যাবো, এমন সময় সামনে দেখি একটা জাতসাপ, কেউটে। তার মুখে একটা ব্যাং। বুঝলি, একেই বলে, যে খায় চিনি, তাকে জোগায় চিন্তামণি।···আমি তখুনি তাকে 'তু-তু' করে ডাকতেই সে কাছে সরে এলো।

—তোমার ভয় করলো না? আমিই ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলাম।

—ভয়? নন্তেদা বললো, তখন মাথায় ভাবনা, কি করে মাছ ধরি। বরং ভাবনা হলো, ব্যাংটাকে কি করে হাত করা যায়···হ্যাঁ, বুদ্ধি এসে গেল। ঐ দুধ আর কলা সাপটার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললাম, নে, খা, খা। তোর জন্যে এনেচি।—কিন্তু সাপটা মুখে ব্যাং ধরে ফণা উঁচু করে গুম রইলো। আমি বুঝলাম, সাপটা ভাবচে, ব্যাংটা খাবে, না, দুধ-কলা খাবে।···আমি তখন সাধতে লাগলাম, কী? অত ভাবচো কী? নাও, খেয়ে নাও। লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার। আচ্ছা, আমি দেখবো না, এই চোখ বুজে আছি। চোখ বুজে বলতে লাগলাম, কে খায়, কে খায়? আমার সোনামণি খায়, না, কাক এসে খায়।

তাড়াতাড়ি বললাম, কী সাহস তোমার নন্তেদা! চোখ বুজে থাকলে, যদি কামড়ে দিতো!

—আঃ, শোন না আগে! নন্তেদা বললো, আমি মিটমিট করে দেখতে লাগলাম। দেখি, সাপটা আমার দিকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে মুখের ব্যাংটাকে ছেড়ে দিয়ে ফণা গুটিয়ে আমার দুধের শিশিতে মুখ দিলো। কলা দুটোও গপগপ করে খেয়ে নিলো। তারপর চলে গেল, বোধহয় দিবানিদ্রা দিতে! আর আমি তখন পকেট থেকে ছুরি বার করে ব্যাংটাকে কেটে-কুটে বঁড়শির মুখে লাগিয়ে—বুঝলি, টপাটপ মাছ ধরতে লাগলাম। ওঃ, আধঘণ্টায় প্রায় মণ দুই মাছ ধরে হঠাৎ খেয়াল হলো, অতো মাছ বয়ে নিয়ে যাবো কেমন করে?

—আহা, আমি যদি থাকতাম! বলেই ফেললাম।

নন্তেদা বললো, থাকলেও কি মাছ ধরা পর্যন্ত জ্ঞান থাকতো তোর। ঐ সাপ দেখেই তো—

—তা বটে। স্বীকার করলাম।

নন্তেদা বললো, কী আর করি, অত মাছ তো একলার পক্ষে—কাজেই প্রায় দেড়মণ মাছ আবার ঠেলে পুকুরে ফেলে দিয়ে আধমণখানেক বেঁধে-বুধে নিয়ে উঠতে যাবো, হঠাৎ শুনি পিছনে হিস-হিস শব্দ। দেখি সেই সাপটা। এবার দেখি ব্যাটার মুখে দুটো ব্যাং। দুধ-কলার লোভে আমাকে ঘুস দিতে এসেচে।···আমার তখন আর ব্যাংয়ের কি দরকার? যেন দেখতে পাইনি ভাব করে উঠে যাচ্ছিলাম, দেখি, ব্যাটা আমার পেছনে পেছনে আসচে। দেখে রাগ হয়ে গেল। আচ্ছা হ্যাংলা তো! আমি হাতের মাছগুলো মাটিতে রেখে—সাপটির গালে ঠাস করে এক চড় বসালাম। চড় বসাতেই তার মুখের ব্যাং দুটো গেল ছিটকে। আর হিস্ হিস্ নয়, 'ইস্' করে উঠলো সাপটা। দেখি, তার দু'চোখে জল। আমি আবার কারোর চোখে জল দেখতে পারিনে। তাই তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে মাছগুলো তুলে চলে এলাম বাড়ি।

সব শুনে, আমি আর না জিগ্যেস করে পারলাম না: আচ্ছা নন্তেদা, সাপটা না হয় ব্যথার চোটে 'ইস' করে উঠলো, কিন্তু দু'দুটো ব্যাং মুখে নিয়ে হিস্-হিস্ করছিলো কি করে?

শুনে নন্তেদা গম্ভীর হয়ে বললো, ঐ তোর দোষ। সব কিছুতেই জেরা করা। একি কোর্ট-কাছারি পেয়েচিস? গপ্পো ইজ গপপো। জেরা করতে নেই।

এ গল্প আমার বন্ধুদের কাছে করিনি। আর মাছ ধরবার 'চার' যাতে ভুলে না যাই, প্রথমেই তাই শিয়ালদার বাজার থেকে ভাল 'চার' কিনে নিয়ে থলে ভর্তি করে আমরা নন্তেদার ভগ্নীপতির বেলঘোরের বাড়ির পুকুরে পরদিন মাছ ধরতে গেলাম।

আর বিকেলবেলা ফেরবার সময় শ্যামবাজার থেকে প্রত্যেকেকই একটা করে মাছ কিনে বাড়ি ফিরতে হলো! বাড়িতে মুখ দেখাতে হবে তো!

ন্যাড়াটা বড় বোকা। বাজারে গিয়ে বলে, টাটকা ইলিশ কেন্।

ধমক দিয়ে বললাম, শহুরে ছোকরা তুমি, তাই ভাবো ধানগাছে তক্তা হয়। বাড়ি গিয়ে পুকুরের ইলিশ বলতে গেলেই—ব্যাস্! বুঝলি?

কেশবতী তেল

নন্তেদা একদিন কথায় কথায় বললো, জানিস তো তোরা, আমি একবার বল্ডউইন হেয়ার টনিকের কারবার করেছিলাম। পরে ওটা ফোর-টোয়েন্টির ব্যাপার বলে ছেড়ে দিলাম। তবে সেদিন আমি নিজেই এক কেশবতী তেল-এর সেলসম্যানের পাল্লায় পড়েছিলাম।

আমরা বলে উঠলাম, কি রকম কি রকম, শুনি শুনি।

নন্তেদা বললো, আমরা স্টীমারের ডেক-এ রেলিং হেলান দিয়ে গল্প করছিলাম। এক ভদ্রলোক আর আমি। ডায়মন্ডহারবারের দিকে যাচ্ছিলাম স্টীমারে।

ভদ্রলোক আমার পরিচিত নন। তবে স্টীমার-যাত্রায় নদীর ঢেউ গোনা ছাড়া যখন আর কোন উপায় থাকে না, তখন কারোর সঙ্গে গল্প জমানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

অবশ্য ভদ্রলোক নিজেই যেচে আলাপ করলেন আর তাঁর দু'এক কথাতেই বোঝা গেল, ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। তবে ভদ্রলোক যখন নিজে এসেই কথা বললেন, তখন উত্তর না দেওয়াটাই হতো অভদ্রতা।

এক-একজন আছেন, যাঁরা কাউকে বড় কথা বলতে দেন না, নিজেরাই হরদম বলতে থাকেন—যেন গ্রামোফোনের রেকর্ড। একবার বাজলে হয়, আর থামতে চায় না। ভদ্রলোক ঐ জাতীয় জীব একটি।

ভদ্রলোক নিজের নাম বললেন, ধাম বললেন, কোত্থেকে আসচেন বললেন, কোথায় থাকেন বললেন, কোথায় দেশ বললেন এবং আরো হড়বড় করে অনেক কিছুই বললেন তিনি। আমি শুধু তাঁর কথার ফাঁকে ফাঁকে 'হুঁ-হ্যাঁ' করে যেতে লাগলাম—যেন গানের তালে তালে তবলার ঠেকা।

কথায় কথায় ভদ্রলোক বললেন, তাঁর কোনরকম নেশা নেই, আর পেশা হচ্চে 'কেশবতী তেল' বিক্রী করা। ঐ কোম্পানীর সেলসম্যান তিনি।

অথচ, আশ্চর্য, ভদ্রলোকের নিজের মাথাতেই টাক।

এবার আর না বলে পারলাম না : তা, আপনার মাথায় বিরাট টাক যে?

—হ্যাঁ, আছেই তো টাক!

বললাম, তবে?

বললেন, এ টাক আগেকার, এখনকার নয়।

—তা, আপনি ঐ তেল ব্যবহার করেন না কেন? নামটা শুনে তো মনে হচ্চে মাথায় মাখলে চুল গজায়।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, ঠিক ধরেচেন। এ তেলের অদ্ভুত গুণ। যেখানে লাগাবেন, প্রায় সঙ্গেসঙ্গে চুল!

বললাম, সত্যিই অদ্ভুত তো?—

—নইলে কি আমি যা-তা তেলের জন্যে ঘুরে বেড়াই? ভদ্রলোক যেন কথাটা বললেন সগর্বে।

বললাম, তবে তো এতদিন আপনার মাথায় টাক থাকবার কথা নয়।

—নয়ই তো! ভদ্রলোক বললেন, আমার টাকটা পৈতৃক কিনা, কাজেই একটু সময় নিচ্চে। আর হাজার হোক পিতার দান—মাথা পেতে নিয়েচি, কাজেই হুট করে তাঁর স্মৃতিটা নষ্ট করতেও চাইনে।

হাসি চেপে বললাম, তা তো বটেই!

ভদ্রলোক বললেন, 'কেশবতী তেল' তাই আমি ইচ্ছে করেই অনিয়ম করে মাখি।

বললাম, অ।

—জানেন? ভদ্রলোক বললেন, একবার কি হয়েছিলো?

—কি?

—গত বছরে এক বেটা চোর আমাদের স্টোর থেকে এক পেটি তেল নিয়ে ভাগবার চেস্টায় ছিল। এমনসময় দারোয়ান তাড়া করতেই তাড়াতাড়ি তেল ভর্তি প্যাকিং বাক্সটা পুকুর পাড়ে ফেলেই দে চম্পট।

—তারপর?

—আর কি! ভদ্রলোক বললেন, প্যাকিং বাক্সের ভেতরে তেলের শিশি

অনেকগুলো গেল ভেঙে ! আর সুগন্ধী তেল সব গড়িয়ে পড়লো পুকুরের জলে ।

—সর্বনাশ ! আপনাদের অনেক ক্ষতি হলো তো ?

—তা হলো বটে । তবে দারুণ পাবলিসিটি হয়ে গেল ।

—কি রকম ?

—মানে, পুকুরের সব মাছের গায়ে মুড়োয় চুল দাড়ি গজিয়ে গেল ঐ তেল গায়ে লেগেছিলো কি না—

শুনে গম্ভীর হয়ে আবার বললাম, অ ।

—আর সেই খবর পেয়ে চারধার থেকে লোক আসতে লাগলো, জেলের মাছ ধরতে লাগলো, তবে আবার ছেড়ে দিতে লাগলো জলে । কী হবে ও সব চুলো মাছে ? শেষে প্রেস ফটোগ্রাফাররাও এসেছিলো ।

এবার বললাম আমি ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই তো ! এতক্ষণে মনে পড়ছে আমার । দেখলেন কি ভুলো মন !

শুনে ভদ্রলোক এবার আশ্চর্য হলেন, আপনি জানেন ব্যাপারটা ?

—জানিনে ! খুব জানি । বললাম আমি ঃ যে ভদ্রলোকের পুকুরের মাছ নষ্ট হয়েছিলো আপনাদের তেলে, সে ভদ্রলোক তো রেগে কাঁই। আপনাদের নামে দশ হাজার টাকার খেসারত দেবার জন্যে উকিলের চিঠিও দিয়েছিলেন ।

—তাই নাকি ? ভদ্রলোক বললেন, আমি তো তা জানিনে !

বললাম, হয়তো আপনি তখন বাইরে কোথাও বেরিয়েছিলেন অর্ডা পত্রের জন্যে ।

ভদ্রলোক ভেবে বললেন, তা—তা হবে ।

আমি বললাম, যে উকিল চিঠি দিয়েছিলেন, তিনি আমার বন্ধু । তাঁ মুখে সব শুনেই আমি সঙ্গেসঙ্গে চলে গেলাম আপনাদের কর্তার কাছে। তিনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজী হওয়ায় বাঁচিয়ে দিলাম তাঁকে ।

—তাই নাকি ?

—নয় তো বাজে কথা বলচি ?

—না, মানে—ভদ্রলোক থতমত খেলেন ।

বললাম, মানে পুকুর ধারের গাছের সব ডাল বড় বড় করে ভেঙে-ভে তাতে কয়েক ডজন ব্লেড আটকে সেগুলো পুকুরের মধ্যে পুঁতে দিলাম ।

—ব্লেড ! ভদ্রলোক হাঁ করলেন ।

বললাম, হ্যাঁ স্যার, ব্লেড, 'গুডমর্ণিং' মার্কা ব্লেড ।

—কেন ? ভদ্রলোকের প্রশ্ন ।

—কেন আবার ? মাছগুলো ঐ ব্লেডে গা ঘষে ঘষে গায়ের মুড়োর সব চুল,দাড়ি কামিয়ে ফেললো । তা, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ।

—আপনি বলেন কি মশায় ?

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়, আর শুধু কি তাই ! পুকুরের মাছ তোলা হয়ে গেলে, বর্ষার আগে ঐ পুকুরের সুগন্ধী জলটা পাম্প করে তুলে ফুটিয়ে নির্যাস করে স্রেফ বিক্রী করে দিলাম আপনাদের কোম্পানীকেই ।

শুনে ভদ্রলোক একটু যেন পিছু হটতে লাগলাম । বললেন, আপনি তো ভীষণ লোক ।···আচ্ছা, চলি ।

—কিন্তু আর একটু বাকি থেকে গেল যে !

—কি ? বলুন—

হেসে বললাম, আমিই হচ্চি ঐ 'গুডমর্ণিং' ব্লেড-এর সেলসম্যান ।

বর্ষা, বৃষ্টি, দুষ্টু, মিষ্টি, আমি—সবাই আমরা নন্তেদার গল্প শুনে আনন্দে সমস্বরে বলে উঠলাম, উঃ নন্তেদা, তুমি একটা···তুমি একটা ··নাঃ, একটা কথাও খুঁজে পাচ্চিনে ।···

নন্তেদার মুখে আবার সেই হাসি !

বাঁধাকপি

আমাদের পিকনিকের জন্যে একটা যুৎসই জায়গা পাওয়া যাচ্ছিলো না।

কচে বললে, আমাদের দমদমার বাগানে হতে পারে। তবে বাবার কাছে একবার শুনে নিতে হবে।

শুনে আমরা সবাই লাফিয়ে উঠলাম, আরে ব্যাস, এত বড় একটা সংবাদ স্রেফ মাঠে মারা যাচ্ছিলো! তুই কি রে? চলে যা এক্ষুনি তোর বাবার কাছে—বেশ সবিনয়ে তোর আর্জি পেশ করবি। বুঝলি?

হঠাৎ আমরা এমনভাবে রাজী হয়ে যাবো, কচে বোধহয় বুঝতে পারেনি। তাই মাথা চুলকে বললো, একটা কিন্তু মুস্কিল আছে।

—ঐ তো সুর কাটচো? বিশে বললো।

—না, ব্যাপারটা হচ্চে কি, বাগানে অনেক তরিতরকারি আছে তো। কাজেই যদি নষ্ট হয়, তাই বাবা হয়তো—

নন্তেদাকে অনেক বুঝিয়ে আমাদের পিকনিকে যেতে রাজী করিয়েছিলাম, বিনা চাঁদায়। কচের কথা শুনে নন্তেদা দাঁত খিঁচিয়ে বললো, আমরা কি গরু যে তোদের বাগানে গিয়ে তরিতরকারি চিবুবো? রান্না তো হবে মাংস ভাত। বলি, মাংস তো আর তোদের বাগানে ফলে না।

—তা নয়। তবে—

—আর তবে নয়। নন্তেদা বললো, যদি বলিস তো তোর বাবার কাছে একটা জয়েন্ট পিটিশন করে দিই—

—কি লিখবে? জিগ্যেস করলাম।

—কি আবার? নন্তেদা বললো, সরল সোজা বাংলায় লিখবো: সবিনয় নিবেদন, আপনার পুত্রের বন্ধুগণ অতি নাবালক ধীর ও শান্ত। আপনার সুবিখ্যাত বাগানে কিঞ্চিৎ মাংসান্ন—এটা একটু ভাল ভাষায় দিতে হবে—

আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। আশাকরি আপনার সহযোগিতা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে না। ইতি—

বিশে বললো, খুব চমৎকার হবে।

কচে কিন্তু চমকে উঠলো, সর্বনাশ, ওসব হবে না। একটু ভেবে বললো, আচ্ছা যা হয় আমি করবো।

—কি করবি? জিগ্যেস করলাম।

—অ্যাপ্লিকেশানটা মা'র থ্রু দিয়ে সাবমিট করতে হবে।

এবং সত্যিই পরদিন কচে ছুটে এলো ক্লাবে। মার দিয়া কেল্লা!

অতএব চাঁদা তুলে পরের শনিবারের বিকেলে সব বাজার করা হলো, আর রবিবারের সকালে মাংসটা কিনে, দোকান থেকেই কাটিয়ে-কুটিয়ে নিয়ে সোজা চলে গেলাম বাগানে—কচেদের বাগানে। সঙ্গে আমাদের নন্তেদা।

সত্যিই, বাগানটা বেশ সাজানো-গোছানো। ছোট্ট একটা পুকুরও আছে। আর পুকুরের পাড়ে নানারকম তরিতরকারির বাগান। লঙ্কা মুলো আলু বেগুন পেঁয়াজকলি টমেটো আর বড় বড় বাঁধাকপি।

একদল চলে গেল রান্নার জোগাড় করতে। আর আমরা কয়েকজন এদিক-ওদিক বেড়াতে লাগলাম। কচেদের বাগান, কাজেই কচে যেন নায়ক হয়ে গেল।

কচে ছেলেটা বেঁটে হলে কি হবে—মুখে খুব লম্বা-লম্বা কথা। সেটা জানতাম আমরা। আর আজ ওদের বাগানে এসে বাধ্য হয়ে শুনতে হলো তার হাই-হাই-টক। সব দেখাতে লাগলো আর শুরু করলো তার গপপো:

বাগানটা নাকি হরিহরপুরের জমিদার ওর বাবাকে প্রেজেন্ট করেচেন, তবে জমিদারকে খাজনা দেওয়া নিয়ম তো? তাই নাকি বছরে এক পয়সা করে খাজনা দিতে হতো। এখন সরকারকে দিতে হয় দু'নয়া পয়সা করে। নারকেল গাছের কতকগুলোতে শুধু ডাব, আর কতকগুলোতে একদম ডাব না হয়ে ডবল প্রমোশন পেয়ে একেবারে নারকেল ফলে।

পরে কচে বললো, চল, তরকারির বাগানটা দেখিয়ে আনি।

—চল। দেখলাম ভেবে কচেদের বাগানে এসেচি যখন, তখন সে যা দেখায়, অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও দেখা দরকার।

তরকারির বাগান দেখতে দেখতে আমরা বাঁধাকপির ক্ষেতে এলাম। কচে

বললো, এ আর কি বাঁধাকপি দেখছিস? গতবারে বাঁধাকপির পাতাগুলো প্রায় ছাতার মত হয়েছিলো। দু'হাত ছড়িয়ে সাইজটাও দেখালো কচে।

শুনে নন্তেদা বললো, লেডিজ ছাতার মতো?

কচে অভিমান কবে বললো, তুমি ভাবচো ইয়ার্কি করচি?

নন্তেদা তাড়াতাড়ি বললো, না, না, মোটেই না। তবে আমি পাঞ্জাবের একটা বাগানে যেরকম বাঁধাকপি দেখেছিলাম, সেই কথাটাই বলি।

—বলো, বলো. নন্তেদা শুনি। সবাই চেপে ধরলাম নন্তেদাকে।

নন্তেদা বলতে লাগলো : পাঞ্জাবে গেছলাম এক রিটায়ার্ড মেজর হরবংশ সিংয়ের বাগানে। এমনসময় ঝমঝম করে বিষ্টি এলো। সামনেই বাঁধাকপির বাগান। মেজর তাড়াতাড়ি বাঁধাকপির মাত্র একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আমার মাথায় ঢাকা দিয়ে বললেন, উই আর সেভড। সত্যিই। মেজরও ঐ পাতার তলাতেই তাঁব পাগড়ি-সুদ্দু মাথাটা ঢুকিয়ে দিলেন। দুজনেই ছাতার মতো পাতার তলায় মাথা দিয়ে দাঁড়ালাম. আব আশ্চর্য, একটা ফোঁটা বিষ্টিও আমাদের মাথায় গায়ে লাগলো না।

—খুব তাজ্জব তো। কচে বললো।

আমবাও অবাক হয়ে বললাম, সত্যিই. এমন দেখা যায় না। তা সেই মেজর অমন বাঁধাকপি এগজিবিশনে দিয়েচেন নিশ্চয়ই। প্রাইজও পেয়েচেন।

নন্তেদা বললো, আমি বলেছিলাম তাঁকে। কিন্তু তিনি বললেন, লোকে নজর দেবে।

আমরা বললাম, তা নজর দেবারই কথা।

পরে নন্তেদা বললো, মেজর কিন্তু আমাকে চটিয়ে দিলেন। বললেন, এইসা বড়া গবি বংগালমে হোতা হ্যায়? ওরা কপিকে গবি বলে। কিন্তু দেশ তুলে কথা বলা? বললাম, হোতা হ্যায়। আউর এতনা বড়া কড়াই হোতা হ্যায় যে উসমে আপকো একশোঠো বাঁধাগবি রসুই হো যায়েগা।

মেজর আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করলেন, কেইসা? কেইসা?

বললাম, এইসা বড়া। বাংলাতেই বলি, কী বললাম—

বললাম, মেজর, এ সংসারে কত কি আশ্চর্যের আছে জানেন না। এই যেমন বাংলাদেশে অনেক কারখানায় খুব বড় বড় লোহার কড়াই তৈরী করা

হয়। এত বড় কড়াই যে মিস্ত্রীরা যখন কড়াইয়ের একদিকটা রিবিট করে, অন্যদিকে দাঁড়ালে হাতুড়ির আওয়াজই শোনা যায় না!

শুনে মেজর হাঁঃ হাঁ, এতনা বড়া?

বললাম, হাঁ মেজর, আপ লেগা তো হাম সাপ্লাই করেগা।

উত্তরে মেজর শুধু বললেন, নেহি, জরুরৎ নেহি। হামলোগ গাব কাঁচাই খাতা হ্যায়।—নে নে চল এখন, রান্না কতদূর হলো দেখি।

হাওয়া-বদল

আমরা বাড়িসুদ্ধ দেওঘর গেছলাম বেড়াতে।

ফিরে এসে নন্তেদার সঙ্গে আমার দেখা হলো, বললাম দেওঘর গেছলাম।

শুনে নন্তেদা বললো, ভাল, ভাল। পশ্চিমের হাওয়ার অনেক গুণ। শোন তবে একটা ঘটনার কথা।

—বলো, বলো, আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম, তোমার গল্প শুনতে আমরা অলওয়েজ রেডি।

নন্তেদা বললো—

অনেকদিন আগেকার কথা। ভাবলাম, কাছাকাছি দেওঘরটা একবার ঘুরে আসি। হিল্লী-দিল্লী হয়েচে, অথচ হাতের কাছে দেওঘরটা হয়নি। মানে, সময় হয়নি, খেয়ালও হয়নি। অথচ ভাড়াও এমন বেশি নয়। উপরন্তু ওখানে যাওয়া মানে পশ্চিমের হাওয়া খাওয়া আর তীর্থ করা দুই-ই হয়ে যাবে—রথ দেখা কলা বেচার মতোই।

তাছাড়া সেখানে থাকেন মার এক দূর সম্পর্কের কাকা—কাশীশ্বর খুড়ো। তাঁকে মাও কাশীখুড়ো বলতেন, আমরাও বলতাম। মানে, কাশীখুড়ো কোনদিন আর বুড়ো হয়ে দাদু হলেন না। ব্যাচেল্যার খুড়ো দেওঘরে বিঘে দু'তিন জমিতে বাড়ি করে দিব্যি হাত-পা মেলিয়ে থাকেন।

সেখানে গিয়ে উঠলাম আমি।

আমাকে দেখেই কাশীখুড়ো বললেন, এখন এলি ?

বললাম, হ্যাঁ, ট্রেনটা একটু লেট ছিল।

কাশীখুড়ো বললেন হেসে: ট্রেন তো লেট হয়েই থাকে। তবে ইউ আর অলসো লেট—টু-উ লেট।

—কেন ? কেন ? অবাক হলাম খুড়োর কথায়।

—কেন আবার? খুড়ো বললেন, সে-ই এলি পশ্চিমের হাওয়া খেতে, আর পঁচিশটা বছর আগে আসতে পারলিনে?

শুনে হেসে বললাম, খুড়ো, তখন আমি এই ধরাধামেই আসিনি।

কাশীখুড়ো বললেন, যাক, এখন যখন এই অধমের ধামে এসে পড়েছিস, তখন যা পাস সেইটুকুই লাভ মনে করিস! আয়, ভেতরে আয়!

বলে রাখি, কাশীখুড়োর বাড়ির নাম কিন্তু 'অধমের ধাম'।

মার কাছ থেকে আগেই শুনেছিলাম, কাশীখুড়ো বড্ড বেশি বকেন, এবং বাজে বকেন। গিয়ে দেখি কথাটা হাড়েহাড়ে সত্যি। আর উঠতে-বসতে হা-হুতাশ ঃ এই, সেকালে ঐ ছিল, একালে সব গেল। মাথা খারাপ হয়ে যায় শুনতে-শুনতে। অথচ শুনতেই হয়। হোটেল-খরচা বাঁচাতে গেলে হোস্ট-এর খেয়াল-খুশি মাফিক মাথা না নেড়ে উপায় নেই।···দেওঘর থেকে ফেরবার আগের দিন খুড়ো আমার জন্যে স্পেশাল ডিশের ব্যবস্থা করলেন, মুরগীর মাংস আর ভাত। দু'জনে খেতে বসেচি—খুড়ো জিগ্যেস করলেন, কেমন পশ্চিমে হাওয়া খেলি বল্?

এক গরস ভাত মুখে তুলে বললাম, ভালই।

—ঘোড়ার ডিম! খুড়ো বললেন, এখন এখানে সে হাওয়া আর আছে? আগে ড্যাণ্ডি-বাবুরা এসে বাজারে আগুন লাগিয়ে গেচে আর এখন একালের কুবেরের দল এসে পশ্চিমী হাওয়াটাকে বিষিয়ে দিচ্চে।

শুনে অবাক হলাম ঃ কী রকম?

—কী রকম আবার? খুড়ো বললেন দাঁত খিঁচিয়ে ঃ দেখলিনে—আকাশে সব চিমনি আর ধোঁয়া! সব কারখানা হচ্চে! শিল্প হচ্চে! গুষ্টির মাথা হচ্চে! আরে বাবা, তোরা কি আর ইংরেজের মতো ইণ্ডাস্ট্রি গড়তে পারবি? সে জাতই আলাদা।

মুরগীর একটা ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে বললাম, তা বটে!

—নইলে, লোক যে খরচ করে পশ্চিমের হাওয়া খেতে আসতো—সাধে? শোন তবে বলি একটা ঘটনা। এই পশ্চিমের হাওয়ার গুণ কেমন শোন—

—বলুন। বাটি থেকে খানিকটা ঝোল ঢেলে নিলাম ভাতে।

কাশীখুড়ো দেখলেন, শ্রোতাটি বেশ মোসাহেবী-মার্কা। তাছাড়া এখন সে যে মৌখিক অবস্থায় আছে তাতে তার নাকে যদি কড়া গাঁজার ধোঁয়াও ছাড়া যায় সেটা তাকে গিলতেই হবে।

গিলতেই হলো।

কাশীখুড়ো বলতে লাগলেন, সে অনেক দিনের ব্যাপার। হঠাৎ একদিন এখানে টেলিগ্রাম এলো আমার দিদ্‌মার খুব অসুখ। প্রায় শেষ অবস্থা। আমাকে দেখতে চান। চাইবেনই তো! একমাত্র নাতি তাঁর— খুব আদরের ছিলাম তো!

আমি কৌতূহলের ভাব দেখালাম ঃ তা কি করলেন আপনি?

—আর কি! খুড়ো বললেন, তক্ষুনি ছুটলাম কলকাতায়— পড়িমরি করে, সাইকেলে—

—সাইকেলে? এবার সত্যিই অবাক হতে হলো ঃ কেন? তখন ট্রেন ছিল না বুঝি?

কাশীখুড়ো উদাস হয়ে বললেন, ট্রেন? ছিল হয়তো। তবে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করবার সময় ছিল না। তাছাড়া ভেবে দেখলাম, ট্রেনে ঢিক-ঢিক করে যাওয়া মানে—অনেক সময় নষ্ট করা।

—নষ্ট? আমার খাওয়াও যেন নষ্ট হবার উপক্রম।

—হ্যাঁ। কাশীখুড়ো বললেন, তাই সময় আর নষ্ট না করে তখুনি বেরিয়ে পড়লাম বাঁই-বাঁই করে বাই-সাইকেলে—একটুও কষ্ট হলো না। পশ্চিমের হাওয়ায় মানুষ তো!

—তা তো বটেই। বুঝলাম গাঁজায় দম দেওয়া হচ্চে। কাজেই আমিও দম ধরেই থাকলাম।

—হ্যাঁ, খুড়ো বললেন, জোর প্যাডেল করে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কলকাতায় পেঁৗছে দেখি—দিদ্‌মার তখন প্রায় শেষ অবস্থা। ঘরভর্তি ডাক্তার আর আত্মীয়-স্বজন। সবার মুখ শুকনো—আমচুর। কেউ কেউ কাঁদচে। আর দেখলাম, দিদ্‌মাকে গ্যাস দেওয়া হচ্চে।

—কী গ্যাস খুড়ো? একটু সজাগ করবার জন্যেই জিগ্যেস করলাম।

—কী গ্যাস আবার? খুড়ো মোটেই অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন, ঐ যে, যে গ্যাসে রান্না হয়। রাস্তার আলো জ্বলে।

আমি মাথা নীচু করে হাসি চেপে বললাম, অ।

কাশীখুড়ো বলতে লাগলেন, দিদ্‌মার অবস্থা দেখে আমারও যেন কান্না পেতে লাগলো। অথচ কিছুই করবার নেই। কী যে করা যায়!

এমন সময় বড় ডাক্তার যেন নিজের মনেই বললেন—টু-উ লেট, বড্ড দেরি হয়ে গেচে। এসব রোগীকে পশ্চিমে নিয়ে গিয়ে হাওয়া-বদল করাতে

পারলে—। বাট ইট ইজ আউট অফ কোশ্চেন নাউ!

—হাউ? আমি প্রায় চীৎকার করে উঠলাম। আমার মাথায় একটা বুদ্ধির ঝিলিক খেলে গেল। বললাম, আমি ব্যবস্থা করচি।

—আর ইউ ম্যাড? বড় ডাক্তারের চোখ দুটো গোল হয়ে গেল: এ রোগীকে এক ইঞ্চি সরাতে গেলেই এক্সপায়ার্ড হয়ে যাবে।

গম্ভীর হয়ে বললাম, না, না, সিকি ইঞ্চিও সরাতে হবে না। আপনি দেখুন—

বলেই ছুট্টে ঘরের বাইরে গেলাম। আমার ধুলোমাখা সাইকেলখানা নীচের বারান্দায় হেলানো ছিল—সেখানা টেনে হেঁচড়ে উপরে রোগীর ঘরে নিয়ে এলাম। তারপর একটা রবারের নলের জন্যে এদিক-ওদিক চাইতেই নজরে পড়লো—রবারের নল লাগানো ডুস একটা রয়েচে ঘরের কোণে। তাড়াতাড়ি সেই নলটার রবারের মুখটা আমার সাইকেলের চাকার ভ্যালভ্টা আলগা করে জুড়ে দিলাম তাতে। তারপর হ্যাঁচকা টানে নাক থেকে গ্যাসের পাইপটা টেনে নিয়ে—সেই ডুসের নলটার কালো শক্ত মুখটা—ঐ যে নজল—না কি বলে—সেটা ঢুকিয়ে দিলাম দিদ্মার নাকে।

—নাকে? আমার হাতের ভাতের গরসও বুঝি নাকে ঢুকে যাবার জোগাড়।

—হ্যাঁ, নাকে। খুড়ো বললেন, আর একটু পরেই সবাই দেখলো—দিদ্মা চোখ মেলে চাইচেন। পরে আর একখানা চাকার হাওয়া খুলে নাকে দিতেই, দিদ্মা স্রেফ চাঙা হয়ে বিছানায় উঠে বসে বললেন, ঘরে এত লোক কেন? কী হয়েচে?

দিদ্মার নাক থেকে নলের কালো মুখটা মানে, নজলটা খুলে নিয়ে বললাম, কিচ্ছু হয়নি দিদ্মা। এই দেখো আমি এয়েচি।

—বেশ করেচিস দাদু—বেঁচে থাক। কখন এলি?

বলেই দিদ্মা বললেন, হ্যাঁরে, আমার নাকে কী একটা দুর্গন্ধ আসচে যেন।

ইস! শুনেই জিব কাটলাম মনে মনে: তাড়াতাড়িতে স্রেফ ভুল হয়ে গেচে তো! দিদ্মার নাকে দেবার আগে নজলের মুখটা ধুয়ে নেওয়াই হয়নি।—হকচকিয়ে বললাম, ও কিছু নয় দিদ্মা।

এদিকে আমার ততক্ষণে দম ফাটবার অবস্থা। তবু নিজেকে সামলে

নিয়ে জিগ্যেস করলাম, কিন্তু খুড়ো, একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হলো না।

—কি ?

—মানে, আমতা-আমতা করেই বললাম, সাইকেলের চাকার হাওয়ায় আপনার দিদ্‌মা চাঙা হয়ে উঠলেন কী করে ?

শুনে খুড়ো গম্ভীর হয়ে বললেন, আরে বোকা, ঐ চাকা দুটোতেই তো এই দেওঘরের পশ্চিমের হাওয়া ভরা ছিল।—আরো বললেন, হুঃ, তবু তো পশ্চিমের জল নিয়ে যেতে পারিনি। সে জল খাওয়াতে পারলে দিদ্‌মা হয়তো যৌবন ফিরে পেতেন।

শোনার সঙ্গেসঙ্গে হঠাৎ আমার বিষম লেগে গেল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম আসন থেকে।

এতদিনে বুঝলাম, আমাদের নন্তেদার গুরু কে! নন্তেদার ঐ কাশীখুড়ো।

পেন্নাম খুড়ো, তোমার কৃপায় তোমার শিষ্য এখন আমাদের কাছে বাজীমাৎ করে বেড়াচ্চে।